লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নবপর্যায় ৮৪ বর্ষ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৫ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ | ২২ সফর, ১৪৪৩ হিজরি | ৩০ তাবুক ১৪০০ হি. শা. | ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

“এ যুগ
প্রাণবিসর্জন দেয়ার যুগ নয় বরং
ধনসম্পদ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী
খোদার পথে ব্যয় করার যুগ”

*হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)*
*(আল-হাকাম, ১০ জুলাই ১৯০৩ সাল)*

## সুখবর! সুখবর! সুখবর!

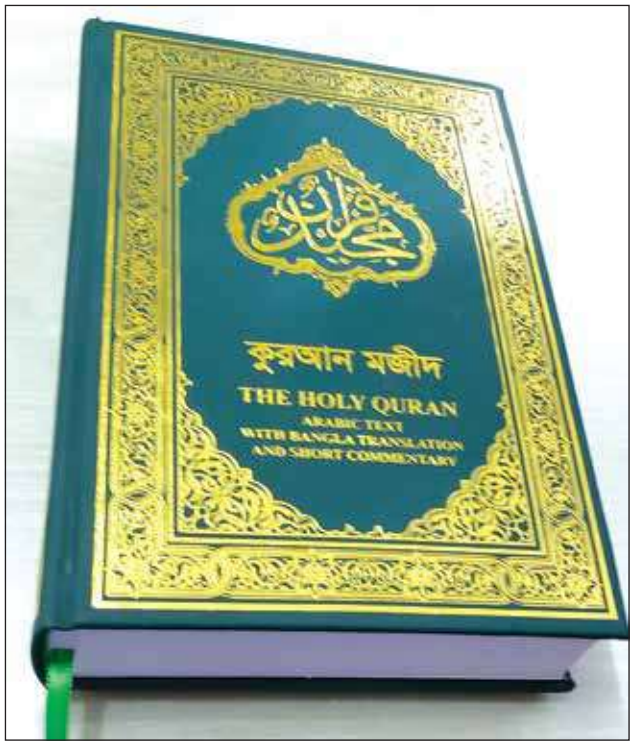


# ‘পবিত্র কুরআন পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে’

বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ পবিত্র কুরআন স্পষ্টাক্ষরে এবং সহজে বহনযোগ্য আকারে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রত্যেককে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করে নিজ নিজ কপি সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

## হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিভিন্ন নির্দেশনার আলোকে লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে

# ‘পর্দা’ – পুস্তক।

প্রিয় হুযূর (আই.)-এর নির্দেশে সেন্ট্রাল বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে পুস্তকটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় ইশায়াত দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

# সম্পাদকীয়

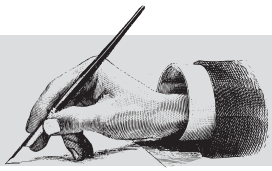

# ‘প্লেগ’

*নিউমোনিয়া, বসন্ত, জ্বর, ফোঁড়া বা গলগণ্ড, বমন, মূর্ছা– এসব ব্যাধি ‘প্লেগ’ শব্দের মাঝে অন্তর্ভুক্ত*

করোনা মহামারি পৃথিবীতে ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ভয়াবহ এই করোনা ভাইরাসের করাল থাবায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। এখনও কোথাও কোথাও করোনায় মৃত্যু ঘটছে বলে সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে। প্রকৃত বিষয় হল, যুগে যুগে মানুষের ওপর বিভিন্ন ধরনের মহামারির ভয়াল থাবা দেখা গেছে। আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতির সংশোধনের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ভয়াবহ রোগব্যাধি দিয়ে থাকেন। এসব রোগব্যাধি দেখে অনেকে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনত হয় আবার অনেকের এই সৌভাগ্য হয় না। ইদানীং করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কিছুটা কমে এসেছে। মানুষ অনেকটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে শুরু করেছে। মহামারির আগমন, ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এবং এরপর কিছুটা সময় বিরতি দেয়া, এমনই ঘটনা ঘটেছিল ১৯০৮ সালে। তখন ১৯০৮ সালের ২ মে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: "এবছর প্লেগের প্রকোপ কিছুটা কমে এসেছে। মানুষ ‘প্লেগ’ সত্ত্বেও (আত্মশুদ্ধি করে) লাভবান হয় নি। যে উদ্দেশ্যে ‘প্লেগ’ এসেছিল, সেই উদ্দেশ্য এখনও পূর্ণ হয় নি। প্রকৃতপক্ষে প্লেগের অর্থ মৃত্যু। অভিধানের ভাষায় সেইসব ভয়ানক ব্যাধির নাম রাখা হয়েছে ‘প্লেগ’ যেসব ব্যাধির পরিণাম মৃত্যু আর আভিধানিকভাবে এই শব্দটি অতি ব্যাপক। বর্তমান যুগে অন্য কোন নামে এই রোগ প্রকাশ পেতে পারে অথবা পরবর্তীতে কখনও এটি আরও ভয়াবহ আকারে প্রকাশ পেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার এলহামেও ‘আফতুরু ওয়া আসুমু’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এমন এক সময় যেভাবে ইফতারে খাদ্য পানীয় বৈধ থাকে তেমনই ‘প্লেগ’ মানুষকে গিলে খাবে আর এমন এক সময় আসবে যখন রোযা রাখার ন্যায় নিরাপদ অবস্থা থাকবে। **"ইন্নি মা'আর রাসূলে আকুমু, আফতুরু ওয়া আসুমু, ওয়া লান আবরাহাল আরদু ইলাল ওয়াকতিল মা'লুম।"**

মানুষ প্রশান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে তাৎক্ষণিক কোন কথা বানিয়ে বলে যেমন বলল, ‘শুনেছ! একটা ব্যাধি এসেছিল যা চলে গেছে’। কিসের নিদর্শন আর কিসের সাবধান বাণী! মোটকথা এ ধরনের চিন্তাধারার মাধ্যমে নিজেদের প্রশান্তি সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে ‘প্লেগ’ শব্দটির অর্থ ব্যাপক। প্রত্যেক সেই ব্যাধি যা মৃত্যু ঘটায় সেটিই ‘প্লেগ’।

নিউমোনিয়া, বসন্ত, জ্বর, ফোঁড়া বা গলগণ্ড, বমন, মূর্ছা ইত্যাদি– এসব ব্যাধি ‘প্লেগ’ শব্দের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। এ কথা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, সাহাবীদের যুগেও এক ধরনের ‘প্লেগ’ দেখা দিয়েছিল এবং তা অতি সূক্ষ্ম একটি দানা বা ফোসকার ন্যায় শরীরে বা হাতে দেখা দিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই ব্যাধিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বা ঘুমের ঘোরে আর অনেক ক্ষেত্রে হাসতে হাসতে এ জগত থেকে মানুষ বিদায় নেয়। অনেকের রক্ত জমাট বেঁধে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে বুঝায়-ই যায় না– কী হয়েছে। দেখা গেল, দশজন লোক রাতে সুস্থাবস্থায় একত্রে ঘুমিয়েছে কিন্তু সকালে কেউ বেঁচে নেই। মোটকথা এমন অনেক ঘটনা দেখা গেছে এবং এর দ্বারা অনুমেয়, এই ব্যাধির বিষয়ে অনেকে জানতেও পারে না। আবার এই ব্যাধির অনেকগুলো ধরনও আছে।

মোটকথা এই ব্যাধি মাঝখানে বিরতি দিলেও মানুষের অপকর্মের কারণে উপকারী সাব্যস্ত হয় নি বরং বড়ই ভয়ানক হবে, কেননা মানুষ এখন বেপরোয়া হয়ে উঠবে আর এমন দুঃসাহসের ফলে অপরাধ করবে আর উক্ত ব্যাধির বিরতিতে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, হ্যাঁ! একটা রোগ এসেছিল যা চলে গেছে, এটা কোন নিদর্শনও না আবার কোন আযাবও না। মোটকথা এখন আনন্দের সুযোগ নেই বরং ভয়ের কারণ, কেননা এখন এমন এক যুগ যখন কিনা প্লেগের কারণে খোদার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে। এমন এক যুগে এই এলহাম হয়েছিল যে, ‘আফতুরু ওয়া আসুমু’ (অর্থাৎ আমি রোযা রাখব আবার ইফতার করব) এটি এক রূপক ভাষা ছিল তথা এই ব্যাধি কখনও প্রকট হবে আবার কখনও এর মাঝে বিরতি আসবে। **"ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়্যেরু মা বিকাওমিন হাত্তা ইউগাইয়িরু মা বিআনফুসিহিম"** যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেদের চরিত্র, কৃতকর্ম এবং চিন্তাধারায় এক ধরনের পরিবর্তন সৃষ্টি না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ কোনভাবেই ক্ষমা করবেন না। *(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৭-২৮৮)*

# সূচিপত্র

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১


**কুরআন শরীফ** ৩

**হাদীস শরীফ** ৪

**অমৃতবাণী** ৫

৩০ জুলাই, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৬
বিষয়: ***হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল***

১৩ আগস্ট, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ১৮
বিষয়: ***আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা***

*কবিতা:* ৩০
**"সুরভিত এক ফুল"**
নিলুফার মমতাজ

**সীরাতুল মাহ্দী (আ.)** ৩১
*প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)*
ভাষান্তর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ

**মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইজতেমায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর সমাপনী বক্তৃতা** ৩৩

*পর্ব-২১* ৩৯
**প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর**

**লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইজতেমায় হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.)-এর সমাপনী বক্তৃতা** ৪২

*কবিতা:* ৪৮
**খেলাফতে আহমদীয়া**
সোহেল মাহমুদ

**মানবসেবা-ই হোক ব্রত** ৪৯
ডাক্তার মোহাম্মদ আতাহার আহমদ

**রাগ বা ক্রোধ সংবরণ** ৫০
মাওলানা ফুরাদ আহমদ

**আমার মরহুম পিতা মোয়াল্লেম ইসরাইল দেওয়ান** ৫২
মিসেস মুসলেহা জাফর

**সংবাদ** ৫৫

**প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত** ৫৬


*প্রচ্ছদ পরিচিতি:* **আল-হাকাম, ১০ জুলাই ১৯০৩ সাল**

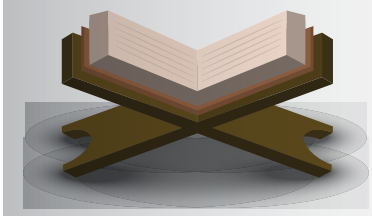

# কুরআন শরীফ

## সূরা মারইয়াম-১৯

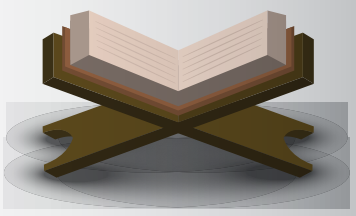

*[চলমান]*

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧١﴾

৭১। আর[১৭৯২] তাদের মাঝে যারা আগুনে দগ্ধ হওয়ার বেশি যোগ্য[১৭৯৩] আমরা তাদের ভালভাবে জানি।

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧٢﴾

৭২। আর তোমাদের (অর্থাৎ যালেমদের) প্রত্যেকেই[১৭৯৩-ক] এতে পতিত হবে। এ হল তোমার প্রভু-প্রতিপালকের অমোঘ সিদ্ধান্ত।

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٣﴾

৭৩। আর আমরা মুত্তাকীদের রক্ষা করবো এবং যালেমদের নতজানু অবস্থায় সেখানে ছেড়ে দিব।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٤﴾

৭৪। আর আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ[১৭৯৪] যখন তাদের পড়ে শোনানো হয় তখন যারা অস্বীকার করেছে তারা মু'মিনদের বলে, 'উভয় দলের মাঝে কোনটি পদমর্যাদার দিক দিয়ে উত্তম এবং সঙ্গীসাথীর দিকে থেকে বেশি ভাল'?

---

১৭৯২। এই আয়াতে 'সুম্মা' শব্দ ঘোষণামূলক আদেশ বুঝাতে অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, হুকুম রূপে ব্যবহৃত হয় নি এখানে এর অর্থ হবে এবং। এখানে এই শব্দের মর্ম এবং তার একটি বিষয় আমরা তোমাদেরকে বলব যে...

১৭৯৩। এই শব্দগুলোর মর্মার্থ হতে পারে : (ক) যারা বাইরে না থেকে আগুনের মধ্যেই দগ্ধ হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত, (খ) যারা অন্যান্যদের অপেক্ষা অগ্নিদগ্ধ হওয়ার জন্য বেশি উপযোগী, (গ) যারা অন্য কোন উপায় ছাড়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে বেশি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

১৭৯৩-ক। 'মিনকুম' শব্দের মধ্যে কুম সর্বনাম সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় নি। বর্ণনার প্রসঙ্গানুযায়ী এটা অবিশ্বাসীদের এবং পরকালের অস্তিত্বে সন্দেহপোষণকারী যারা, কেবল তাদের প্রতি প্রযোজ্য। এই সকল লোকের বিষয়ই পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস এবং ইকরামা (রা.)-এর অন্য এক বর্ণনা 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) 'মিনহুম' (তাদের মধ্য থেকে) রূপে বর্ণিত হয়েছে এবং হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মিনকুম' উক্তি অবিশ্বাসীদের প্রতি করা হয়েছে (কুরতুবী)। সুতরাং ৬৭-৭১ আয়াতে উল্লিখিত অবিশ্বাসীদের প্রতিই 'কুম' (তোমরা বা তোমাদের) স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে। অপরপক্ষে কুরআন করীম সুস্পষ্ট এবং জোরের সাথে এই মতের সমর্থন করে, ধর্মপরায়ণ বিশ্বাসীগণ কখনও দোযখে যাবেন না। তারা সর্বদা আল্লাহ তা'লার ভালবাসা ও অনুগ্রহের আলোতে অবগাহন করবে (২৭:৯০; ৩৯:৬২; ৪৩:৬৯; ইত্যাদি) এবং জাহান্নাম থেকে বহুদূরে অবস্থান করবে এবং তার ক্ষীণতম শব্দও তাদের কানে পৌঁছবে না (২১:১০২-১০৩)। কিন্তু যদি মু'মিন এবং কাফির উভয়কে 'কুম' (তোমাদের)-এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয় তাহলে কাফিরদের ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে, তারা সকলেই জাহান্নামে যাবে এবং মু'মিনগণের ক্ষেত্রে আয়াতে ইশারাকৃত দোযখের মর্ম হবে ইহজীবনে যে পরীক্ষা ও মানসিক যন্ত্রণারূপ অগ্নির মধ্য দিয়ে তাদেরকে অতিক্রম করতে হয় এবং যা অত্যন্ত দৃঢ়তাপূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতে হয় এবং যার মধ্য থেকে পরিণামস্বরূপ তাদেরকে বের করে এনে শান্তি এবং জান্নাতের সুখের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়, যেমন তা পরবর্তী আয়াতেও প্রতিভাত হয়েছে। মহানবী (সা.) নিজে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত : একদা যখন নবী করীম (সা.) বলছিলেন, তাঁর ঐ সকল সাহাবা দোযখে যাবেন না, যারা বদরের যুদ্ধে বা ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তখন আমি এই আয়াতের প্রতি মহানবী (সা.)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করলে এর ভুল অর্থ করার জন্য তিনি আমাকে মৃদু তিরস্কার করলেন এবং বললেন, 'পরবর্তী আয়াত পাঠ কর' (মুসলিম, জামীউল বায়ানে উল্লিখিত)। রসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী হাফসা (রা.)-কে পরবর্তী আয়াত ৭৩ এর প্রতি নির্দেশ দ্বারা বুঝা যায়, মহানবী (সা.)-ও উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত সুম্মা অংশের অর্থ সংযোজনকারী অব্যয় 'এবং' অর্থে বুঝেছিলেন আর পরবর্তী আয়াতকে স্বাধীন ও পৃথক ধারা বলে জানতেন। নতুবা তিনি হযরত হাফসা (রা.)-কে তফসীরাধীন আয়াতের ভুল অর্থ বুঝার কারণে তিরস্কার করতেন না।

১৭৯৪। 'নিদর্শন' কেবল কোন বস্তুর অস্তিত্ব, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও যুক্তিভিত্তিক বিচার দ্বারা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু সুস্পষ্ট নিদর্শন হল সেই সব প্রতীক-চিহ্ন বা যুক্তি যা কেবল কোন কিছুর অস্তিত্বকেই নির্দেশ এবং প্রমাণ করে না, বরং তা সম্পূর্ণ সময়োপযোগী এবং যুগসমস্যাবলীর প্রমাণে যথোচিত এবং যা সৎ ও মহিমান্বিত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সেই সব উত্তমভাবে সমাধা করে থাকে।

# হাদীস শরীফ

## আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্থব্যয়

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، - قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

" أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "

*(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত)*

আবু রাবী যাহরানী ও কুতায়বা ইবনে সাঈদ (রহ.) বর্ণিত হাদীস... হযরত সাওবান (রা.) বর্ণনা করেন মহানবী (সা.) বলেছেন: "সর্বোত্তম সেই দীনার (মুদ্রা) যা কোন ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে এবং সর্বোত্তম সেই দীনার (বা মুদ্রা) যা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ বা চেষ্টা-সাধনার জন্য বেঁধে রাখা পশু (বা বাহনের) জন্য কোন ব্যক্তি ব্যয় করে এবং (সর্বোত্তম সেই মুদ্রা) যা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ (বা চেষ্টা-সাধনাকারী) সঙ্গী-সাথীদের জন্য কোন ব্যক্তি ব্যয় করে।"

***সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:*** উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যেকোন ব্যয় পুণ্য বলে পরিগণিত হয়। কেউ যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজ পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ করায়, তা-ও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে পুণ্য বলে বিবেচিত হয়। এছাড়া যারা আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টা সাধনা করে, তারা যে বাহন ব্যবহার করে, সেই বাহনের ব্যয়ভার বহন করাও পুণ্যকর্মের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে বা চেষ্টা-সাধনা করে তাদের ব্যয়ভার নির্বাহ করাও বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়। যারা মু'মিন তারা কখনও একটি একটি পুণ্য করেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে পড়ে না বরং একের পর এক পুণ্যকর্ম করতেই থাকে এবং আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে গিয়ে উপনীত হয়। তাই উপর্যুক্ত প্রতিটি পুণ্যকর্ম করার জন্য নিশ্চয় প্রতিটি মু'মিন সচেষ্ট হবে। আরেকটি বিষয় হল, পরিবরের ভরণপোষণের পাশাপাশি ধর্মসেবার নিমিত্তে যেভাবে মহানবী (সা.) এবং তাঁর খলীফাদের যুগে সবাই বায়তুলমালে নিজ অর্থ জমা করত, ঠিক সেভাবে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের মাঝে বায়তুল মাল আছে যেখানে এ জামা'তের সদস্যরা ধর্মের সেবায় বায়তুল নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী অর্থ জমা করে। এর মাধ্যমে প্রত্যেক আহমদী সদস্য মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী পুণ্য লাভ করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সদা সচেষ্ট থাকে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয়কারীদের আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কার দিন।

# অমৃতবাণী

## আর্থিক কুরবানী

প্রতিদিন শত শত মানুষ বয়আত করে চলে যান, কিন্তু খোঁজ নিলে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প পাওয়া যায় যারা নিয়মিত মাসে মাসে চাঁদা প্রদান করেন। যে ব্যক্তি নিজ অবস্থা ও সাধ্যানুযায়ী কয়েক পয়সা দিয়ে এই জামা'তের সাহায্য করে না তার কাছ থেকে কি-ই বা আশা করা যেতে পারে আর তার সত্তা দ্বারা এই জামা'তের লাভ-ই বা কি? একজন সামান্য মানুষ যতই দরিদ্র হোক না কেন, যখন সে বাজারে যায়– নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের জন্য আর তার সন্তানদের জন্য কিছু না কিছু আনেই। তাহলে এমন মহান উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক তার পক্ষ থেকে এর জন্য কয়েকটি পয়সা কুরবানীর যোগ্যতাও রাখে না? পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত পার্থিব হোক বা ধর্মীয়ই হোক এমন কোন্ প্রতিষ্ঠান ছিল বা আছে যা বিনা অর্থব্যয়ে চলতে পারে? এ জগতে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেকটি কাজ উপকরণের মাধ্যমেই সমাধার ব্যবস্থা করেছেন, কেননা এটা উপকরণভিত্তিক একটি জগত। সে ব্যক্তি কত কৃপণ আর হাতটান যে এত মহান উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কয়েক পয়সার মত সামান্য জিনিস ব্যয় করতে পারে না!

তাই তোমাদের মাঝে উপস্থিত আর অনুপস্থিত সবাইকে আমি গুরুত্বের সাথে বলছি, নিজ ভাইকে চাঁদার অন্তর্ভুক্ত কর। এ সুযোগ আর পাবে না। এ যুগ কত বরকতপূর্ণ! কারও কাছে প্রাণের কুরবানী চাওয়া হচ্ছে না। এ যুগ প্রাণবিসর্জন দেয়ার যুগ নয় বরং ধনসম্পদ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খোদার পথে ব্যয় করার যুগ। *(আল-হাকাম, ১০ জুলাই ১৯০৩ সাল)*

পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন– পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহ্‌মদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org**

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
**pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com**

৩০ জুলাই, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

# হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:

## *হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল*

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল আর তাঁর যুগে যেসব যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল সেগুলোর উল্লেখ করা হচ্ছিল। মাদায়েন জয় করা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নাবীঈন (সা.) পুস্তকে লিখেছেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে অবগত হয়ে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) লিখেন,

পরিখা খনন করার সময় একটি জায়গা থেকে একটি পাথর বের হয় যা কোনভাবেই ভাঙ্গছিল না আর সাহাবীদের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁরা তিনদিন অনবরত উপোস থাকার কারণে নিথর হয়ে পড়ছিলেন। অবশেষে বিরক্ত হয়ে তাঁরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, একটি পাথর আছে যা কোনভাবেই ভাঙ্গছে না। তখন মহানবী (সা.)-এর অবস্থাও এমন ছিল যে, ক্ষুধার তাড়নায় (তিনিও) পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ সেখানে যান এবং একটি কোদাল নিয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে সেই পাথরে আঘাত করেন। লোহার আঘাতে সেই পাথর থেকে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়, তখন তিনি (সা.) উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর পাঠ করেন

আর বলেন, আমাকে সিরিয়ার চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে আর খোদার কসম! এখন সিরিয়ার লাল (রঙের) প্রাসাদগুলো আমার চোখের সামনে রয়েছে। এই আঘাতের ফলে সেই পাথর কিছুটা ভেঙ্গে যায়। দ্বিতীয়বার তিনি (সা.) পুনরায় আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কোদাল দিয়ে আঘাত করেন এবং আবার একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়, তখন তিনি (সা.) পুনরায় আল্লাহু আকবর পাঠ করেন আর বলেন, এবার আমাকে পারস্যের চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে আর মাদায়েনের শুভ্র প্রাসাদগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি। এবার পাথরটি আরও কিছুটা ভেঙ্গে যায়। তৃতীয়বার তিনি (সা.) পুনরায় কোদাল দিয়ে আঘাত করলে আবার একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয় আর তিনি (সা.) পুনরায় আল্লাহু আকবর পাঠ করেন আর বলেন, এবার আমাকে ইয়েমেনের চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে, আর খোদার কসম! এখন আমাকে 'সানা'র ফটকগুলো দেখানো হচ্ছে। এবার সেই পাথরটি পুরোপুরি ভেঙ্গে স্বস্থান থেকে পড়ে যায়। এছাড়া আরেকটি বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে, মহানবী (সা.) প্রত্যেকবার উচ্চস্বরে তকবীর পাঠ করেন এরপর সাহাবীদের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি (সা.) এসব কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শন বর্ণনা করেন। আর মুসলমানরা এই সাময়িক প্রতিবন্ধক অপসারণ করে পুনরায় নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অর্থাৎ পাথর ভাঙ্গার যে কাজ স্থগিত ছিল পুনরায় নিজেদের কাজে রত হন আবার পরিখা খননের কাজ আরম্ভ হয়।

মহানবী (সা.)-এর এই দৃশ্যগুলো কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শন ছিল। মোটকথা সেই কষ্টকর মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মুসলমানদের ভবিষ্যতের বিভিন্ন বিজয় ও স্বাচ্ছন্দ্যের দৃশ্যাবলী দেখিয়ে সাহাবীদের মাঝে আশা এবং আনন্দ উদ্দীপনার চেতনা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাহ্যত সেই সময়কার অবস্থা এমন সংকটপূর্ণ ও কষ্টদায়ক ছিল যে, মদীনার মুনাফেকরা এসব প্রতিশ্রুতির কথা শুনে মুসলমানদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলত যে, বাড়ির বাইরে পা রাখার মুরোদ নেই অথচ রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এসব নিয়ামত বা প্রাচুর্য মুসলমানদের অদৃষ্টে লেখা হয়ে গিয়েছিল। অতএব, এসব প্রতিশ্রুতি আপন সময়ে অর্থাৎ কিছু মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে আর বেশিরভাগ তাঁর খলীফাগণের যুগে পূর্ণ হয়ে মুসলমানদের ঈমান বৃদ্ধি ও প্রশান্তির কারণ হয়। *[সীরাতে খাতামান্নাবীঈন (সা.), প্রণেতা হযরত সাহেবযাদা মীর্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) এম.এ., পৃষ্ঠা: ৫৭৭-৫৭৮]*

মাদায়েন বিজয়ের প্রতিশ্রুতি হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে হযরত সা'দ (রা.)-এর হাতে পূর্ণ হয়েছে। যেমনটি মহানবী (সা.)-কে দেখানো হয়েছিল যে, মাদায়েন বিজিত হবে। এটি হযরত উমর (রা.)-এর যুগে পূর্ণ হয়েছে। কাদসিয়া জয় করার পর ইসলামী সৈন্যবাহিনী বেবিলন জয় করে। বর্তমান ইরাকের প্রাচীনতম শহর ছিল বেবিলন। বেবিলন জয়ের পর কুছা নামের এক ঐতিহাসিক জায়গায় তারা পৌঁছে। এই কুছা শহর বেবিলনের সংলগ্ন একটি অঞ্চল। এটি সেই জায়গা যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে নমরূদ বন্দী করে রেখেছিল এবং বন্দীশালা তখনো সুরক্ষিত ছিল। হযরত সা'দ (রা.) যখন এই বন্দীশালা দেখেন তখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন, তিলকাল আইয়্যামু নুদায়েলুহা বাইনান্নাস অর্থাৎ এসব দিন এমন, এগুলোকে আমরা মানুষের মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। সৈন্যবাহিনী কুছা অতিক্রম করে বহরসীর নামক এক স্থানে গিয়ে পৌঁছে। এটি ইরাকের শহর মাদায়েনের একটি অংশের নাম যা দজলা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানে কিসরার শিকারী সিংহ থাকত। হযরত সা'দের বাহিনী যখন নিকটবর্তী হয় তখন তারা এই সিংহকে সৈন্যবাহিনীর ওপর ছেড়ে দেয়। সিংহ গর্জে উঠে সৈন্যবাহিনীর ওপর চড়াও হয়। হযরত সা'দ (রা.)-এর ভাই হযরত হাশেম বিন আবি ওয়াক্কাস সৈন্যবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের নেতা ছিলেন। তিনি সিংহের ওপর তরবারি দিয়ে এমন আঘাত হানলেন যে, সিংহ সেখানেই নিথর হয়ে পড়ে গেল। এরপর মাদায়েনের যুদ্ধও সংঘটিত হয়। মাদায়েনও ইরাকে অবস্থিত, এটি বাগদাদ থেকে কিছুটা দূরে দক্ষিণ দিকে দজলা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। এর নাম মাদায়েন রাখার কারণ কী? যেহেতু এখানে একের পর এক শহর গড়ে উঠেছিল, তাই আরবরা এ অঞ্চলকে মাদায়েন তথা অনেকগুলো শহরের সমষ্টি বলতে আরম্ভ করে। মাদায়েন ছিল পারস্য-সাম্রাজ্যের রাজধানী, এখানে রাজকীয় শুভ্র প্রাসাদসমূহ ছিল। মুসলমান এবং মাদায়েনের মাঝে কেবল দজলা নদী প্রতিবন্ধক ছিল। ইরানিরা নদীর সব পুলই ভেঙে দিয়েছিল। তারীখে তাবারীতে উল্লিখিত আছে যে, নদী পার হওয়ার জন্য হযরত সা'দ (রা.) নৌকা সন্ধান করেন কিন্তু জানা গেল যে, লোকেরা সব নৌকা দখল করে রেখেছে। হযরত সা'দ চেয়েছিলেন, মুসলমানরা নদী পার হয়ে চলে যাক। গ্রামের লোকেরাও নদী পার হওয়ার রাস্তা বাতলে দিয়েছে কিন্তু তারা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে এমনটি করে নি। যাহোক, কতক গ্রাম্য লোকেরা নদী অতিক্রম করার উপায় বলে দিয়েছে যে, অমুক স্থান দিয়ে গেলে তোমরা সহজেই পার হতে পারবে। কিন্তু হযরত সা'দ এটি আমলে নেন নি। তখন নদীর পানিও বেড়ে গিয়েছিল। এক রাতে তাকে স্বপ্নে দেখানো হল, মুসলমানদের ঘোড়া পানিতে নেমেছে এবং নদী অতিক্রম করে ফেলেছে অথচ সেখানে জোয়ারও ছিল। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে

হযরত সা'দ (রা.) নদী অতিক্রম করার দৃঢ় সংকল্প করলেন। হযরত সা'দ সৈন্যবাহিনীকে বললেন, হে মুসলমানেরা! শত্রুরা এই নদীর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আস আমরা এটি সাঁতরে অতিক্রম করি; একথা বলে তিনি নিজ ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলেন। হযরত সা'দ (রা.)-এর সেনারা তাদের নেতার অনুসরণে নিজ নিজ ঘোড়াও নদীতে নামিয়ে দেয় এবং ইসলামী সেনাবাহিনী নদীর অপর পাড়ে এসে উঠে। বিরোধী সৈন্যবাহিনী এই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে ভয়ে ভীত হয়ে চিৎকার করতে থাকে এবং পলায়ন করতে করতে বলে যে, রাক্ষস এসে গেছে রাক্ষস এসে গেছে। মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হয়ে শহর এবং পারস্য-সাম্রাজ্যের শুভ্রপ্রাসাদসমূহ করায়ত্ব করে নেয়। মুসলমানদের আগমনের পূর্বেই পারস্য সম্রাট তার পরিবারের লোকদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। যাহোক মুসলমানরা সহজেই শহর করায়ত্ত করে নেয়। এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হল যে ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.) আহযাবের যুদ্ধের সময় পরীখা খনন করতে গিয়ে পাথরে কোদাল মারার সময় করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমাকে মাদায়েনের শুভ্র প্রাসাদগুলোর পতন দেখানো হয়েছে। এসব প্রাসাদকে জনমানবশূন্য দেখে হযরত সা'দ সূরা দুখানের এই আয়াতগুলো পাঠ করেন,

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ○ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ○ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ○ كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ○

*(সূরা আদ্ দুখান ২৬-২৯)*

অর্থাৎ, তারা কত বাগান ও ঝর্ণা ছেড়ে গেল এবং শস্যক্ষেত ও মনোরম আবাসস্থল, এবং নেয়ামতরাজী, যাতে তারা পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল। বিষয়টি এভাবেই সংঘটিত হয়েছে এবং আমরা অন্য এক জাতিকে এই কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি।

হযরত সা'দ রাজকীয় ধনভাণ্ডার ও অমূল্য রত্নগুলোকে এক স্থানে জড়ো করার নির্দেশ দিলেন। এই ধনভাণ্ডারের মাঝে হাজার হাজার সংখ্যায় বাদশাহদের স্মৃতিচিহ্ন বা স্মারক ছিল, যেমন বর্ম, তরবারি, চাকু, মুকুট, রাজকীয় পোশাক ইত্যাদি। সোনার তৈরি একটি ঘোড়া ছিল যেটাতে রুপার তৈরি জিন পরানো ছিল, আর যার বুকে চুনি ও পান্না খচিত ছিল। একইভাবে রুপার তৈরি একটি উটনি ছিল যার ওপর স্বর্ণের তৈরি গদী বসানো ছিল এবং লাগাম মূল্যবান চুনি গেঁথে তৈরি করা ছিল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মাঝে একটি গালিচা ছিল যেটাকে ইরানিরা বিহার বলত। এই গালিচায় দৃশ্যমান মাটি ছিল স্বর্ণের তৈরি, গাছগুলো ছিল রুপার তৈরি এবং গাছের ফলসমূহ ছিল বিভিন্ন মণিমাণিক্যের তৈরি। এই সমস্ত জিনিসপত্র সৈন্যদল একত্র করেছিল। তবে মুসলমান সেনাদল এতটাই সৎ এবং বিশ্বস্ত ছিল যে, যে যেখানে যেই জিনিস যে অবস্থায় পেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই এনে অফিসারের নিকট উপস্থাপন করেন।" এথেকে মুসলমান সৈন্যদের বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। "অতঃপর যখন সমস্ত জিনিসপত্র একসাথে এনে সাজানো হল এবং অনেক দূর পর্যন্ত মাঠ ঝলমল করে উঠল, তখন হযরত সা'দ এটি দেখে বিস্মিত হয়ে বলেন, 'যারা এই মণিমাণিক্যের মাঝ থেকে নিজের জন্য কিছু উঠিয়ে নেন নি, নিঃসন্দেহে তারা পরম মার্গের বিশ্বস্ত মানুষ।' যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ম অনুযায়ী বন্টন করে এক-পঞ্চমাংশ খলীফার সমীপে পাঠানো হয়। গালিচা এবং প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নসমূহ এজন্য পাঠানো হয় যেন আরবের অধিবাসীরা ইরানিদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি এবং ইসলামের সফলতা ও বিজয়ের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে যখন এই সমস্ত জিনিস উপস্থাপন করা হয়, তখন তিনিও তার সেনাদলের সততা ও বিশ্বস্ততা দেখে বিস্মিত হন।" হযরত উমর নিজেও বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, তার সেনাদল কতটা বিশ্বস্ত! "মুহাল্লম নামের এক ব্যক্তি মদীনায় ছিলেন যিনি বেশ দীর্ঘকায় ও সুশ্রী ছিলেন। হযরত উমর (রা.) আদেশ দিলেন যেন নওশেরভান [জনৈক ইরানি বাদশাহ]-এর পোশাক তাকে পরানো হয়। এসব পোশাক বিভিন্ন উপলক্ষের ছিল। অতঃপর একে একে সব পোশাক পালাক্রমে তাকে পরানো হয়। এসব পোশাকের সৌন্দর্য দেখে মানুষ বিস্ময়াভিভূত হয়। একইভাবে সেই গালিচা যার নাম বিহার ছিল, সেটিকেও বিতরণ করে দেয়া হয়। *(সীরাত আমীরুল মু'মিনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা আস্‌সালাবী, পৃষ্ঠা: ৪১৩-৪১৭, দারুল মা'রেফা বৈরুতে ২০০৭ সনে মুদ্রিত) (আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নো'মানী, পৃষ্ঠা: ১০০-১০৩, ইসলামিয়া প্রকাশনী ২০০৪) (তারিখে তাবারী অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয়াংশ, পৃষ্ঠা: ২৮৮, নাফীস একাডেমী, করাচী ২০০৪) (মো'জেমুল বুলদান, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৫৩, পঞ্চম খণ্ড পৃষ্ঠা: ৮৮-৮৯)*

এরপর যে যুদ্ধ হয় তা হল জালুলার যুদ্ধ, যা ১৬ হিজরিতে সংঘটিত হয়। মাদায়েন বিজিত হবার পর ইরানিরা জালুলা নামক স্থানে একত্র হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। হযরত সাদ (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর আদেশে ইরানি সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য হযরত হাশেম বিন উতবা (রা.)-কে ১২ হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। জালুলা বাগদাদ থেকে খুরাসান যাওয়ার পথে ইরাকের একটি শহরের নাম। এখানে মুসলমান এবং পারস্যবাসীদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা এখানে পৌঁছে শহরটিকে অবরোধ করে রাখে। মাসের

পর মাস এই অবরোধ থাকে। ইরানিরা বিভিন্ন সময় দুর্গ থেকে বাইরে এসে আক্রমণ করে। এভাবে আশিটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। মুসলমানরা জালুলার অবস্থা হযরত উমর (রা.)-কে লিখে পাঠান এবং একই সাথে এটিও লিখেন যে, হযরত কা'কা হুলওয়ান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে আছেন। চিঠিতে হযরত উমরের নিকট অনারবদের পিছু ধাওয়া করার অনুমতি চাওয়া হয়, কিন্তু তিনি (রা.)-এর অনুমতি দেন নি; তিনি বলেন, তাদের পিছু ধাওয়া করবে না। বরং তিনি বলেন, আমি চাই ইরাকের সাওয়াদ (ইরাকের দক্ষিণাঞ্চল) ও ইরানের পাহাড়ের মাঝামাঝি যদি একটি প্রাচীর প্রতিবন্ধক হিসাবে থাকত, তাহলে ইরানিরাও আমাদের দিকে আসতে পারত না এবং আমরাও তাদের এলাকার দিকে যেতাম না। আমাদের জন্য ইরাকের সাওয়াদের গ্রামাঞ্চলই যথেষ্ট। আমি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করার চাইতে মুসমানদের নিরাপত্তাকে অগ্রগণ্য মনে করি।" আমার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্র করার কোন আগ্রহ নেই। মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং তাদের প্রাণের সুরক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সাদ কুযায়ী বিন আমর দাওলী এর মাধ্যমে পঞ্চমাংশ থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ও কাপড় এবং আবু মুফাযযের আসওয়াদের মাধ্যমে বন্দীদের পাঠান। অপর এক বর্ণনামতে পঞ্চমাংশ পাঠানো হয়েছিল কুযায়ী ও আবু মুফাযযের-এর মাধ্যমে এবং এর হিসাব প্রেরণ করা হয় যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানের মাধ্যমে। কেননা তিনি ছিলেন হিসাবনিকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুন্সী আর তিনিই সেগুলো রেজিস্ট্রারে সংরক্ষণ করে রাখতেন। এ সবকিছুই যখন হযরত উমর (রা.)-এর নিকট পৌঁছে তখন হযরত যিয়াদ মালে গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-এর সাথে আলোচনা করেন এবং এর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে অবগত করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, এসব কথা, অর্থাৎ যা কিছু আমাকে বলছ তা কি তুমি মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে? তখন উত্তরে যিয়াদ বলেন, আল্লাহর কসম! আমার অন্তরে আপনার চেয়ে অধিক ভয় ভূ-পৃষ্ঠে আর কারও জন্য নেই। আমি যখন আপনার সম্মুখেই বলে দিয়েছি তখন অন্যদের সম্মুখে কেন বলতে পারব না? অতএব যিয়াদ লোকদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতির পূর্ণ বিবরণ প্রদান করেন এবং মুসলমানরা যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে তা উল্লেখ করেন, অর্থাৎ কীভাবে যুদ্ধ হয়েছে এবং কীভাবে গনীমতের মাল হস্তগত হয়েছে। একই সাথে তিনি বলেন, মুসলমানরা এ বিষয়ের অনুমতি প্রার্থনা করে যে, তারা যেন শত্রুদের পিছু ধাওয়া করতে করতে শত্রুদের দেশ পর্যন্ত যেতে পারে। হযরত উমর (রা.) তার বক্তব্য শুনে বলেন, সে অনেক বড় একজন সুবক্তা। হযরত যিয়াদ বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে খুম্‌স (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ) উপস্থাপন করা হলে তিনি (রা.) বলেন, এখানে এত বেশি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যার সঙ্কুলান কোন ছাদের নিচে সম্ভব নয়, তাই আমি এগুলো শীঘ্রই বিতরণ করে দিব। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আরকাম (রা.) সারা রাত ধরে মসজিদের আঙ্গিনায় এই সম্পদের প্রহরা দেন। সম্পদ এলে সেগুলোকে মসজিদের আঙ্গিনায় রাখা হয় আর এই দুই সাহাবী সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন। সকালে হযরত উমর (রা.) লোকদের সাথে মসজিদে এলে গনীমতের মালের ওপর থেকে কাপড় উঠানো হয়, তখন তিনি (রা.) ইয়াকুত, যবরজদ এবং অনেক মূল্যবান অলঙ্কারাদি দেখে কাঁদতে আরম্ভ করেন। (এ প্রেক্ষিতে) হযরত আব্দুর রহমান (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ্‌র কসম! এটি তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময়। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ বিষয়টি আমাকে কাঁদায় নি। আল্লাহ্‌র কসম! যে জাতিকে আল্লাহ্ এসব কিছু দান করেন তাদের পরস্পরের মাঝে হিংসা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। তোমাদের কাছে যে সম্পদ আসছে এর ফলে তোমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে হিংসা ও বিদ্বেষ যেন সৃষ্টি না হয়ে যায়– এই চিন্তা আমাকে কাঁদিয়েছে। আর যে জাতির মাঝে পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় তাদের মাঝে পরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। *(তারিখুত তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬৮-৪৭১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত ২০১২) (সীরাত আমীরুল মু'মিনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা আস্‌সালাবী, পৃষ্ঠা: ৪২০-৪২১, দারুল মা'রেফা বৈরুতে ২০০৭ সনে মুদ্রিত) (আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নো'মানী, পৃষ্ঠা: ১০৪, ইসলামিয়া প্রকাশনী ২০০৪)*

এটি খুবই চিন্তার একটি বিষয় এবং ইস্তেগফার করারও বিষয় যা তিনি (রা.) বলেছেন আর এগুলোই আমরা প্রত্যক্ষ করছি। বিত্ত-বৈভব বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে মুসলমানদের মাঝে হিংস ও বিদ্বেষও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যাদের তেল সম্পদ রয়েছে অথবা যাদের কাছে অন্য কোন সম্পদ এসেছে তাদের মাঝেও রয়েছে, এককভাবে দেখলেও একই অবস্থা। তাকওয়ার ক্ষেত্রে (সবারই) দুর্বলতা।

মাদায়েনের যুদ্ধের সময় ইরানের সম্রাট ইয়াযদাজার্দ তার রাজধানী মাদায়েন ছেড়ে তার বংশধর ও কর্মচারীদের সাথে হুলুয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। জলুলার পরাজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর ইয়াযদাজার্দ হুলুয়ান ছেড়ে জ্যা-এর

উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং খসরু শনুমকে হুলুয়ানের সুরক্ষার জন্য কিছু সৈন্যসহ রেখে আসে, সে একজন নামকরা সেনাপতি ছিল। কিছু সেনাদলসহ তাকে সেখানে রেখে যায়। হযরত সা'দ (রা.) স্বয়ং জলুলাতে অবস্থান করেন এবং হযরত কা'কা (রা.)-কে হুলুয়ানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। হযরত কা'কা (রা.) হুলুয়ান থেকে ৩ মাইল দূরত্বে অবস্থিত কাসরে শীরীরের নিকট পৌঁছার পর খসরু শনুম নিজে এগিয়ে এসে মোকাবিলা করে কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। হযরত কা'কা (রা.) হুলুয়ান পৌঁছে সেখানেই অবস্থান নেন এবং চতুরদিকে শান্তির বার্তা প্রচার করিয়ে দেন। বিভিন্ন দিক থেকে গোত্রপতিরা এসে এসে জিযিয়া দেয়ার (বিষয়টি) কবুল করে যেত এবং (তারা) ইসলামের সাহায্যার্থে যাতায়াত করত। *(আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নো'মানী, পৃষ্ঠা: ১০৬, মাকতুবাতুল হারামায়েন, উর্দু বাজার, লাহোর ১৪৩৭ হিজরী) (আল আখবারুত তাওয়াল, ওকাআতুল কাদছিয়া, পৃষ্ঠা: ১৮৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত ২০০১)*

মাসাবযান–এর বিজয় কীভাবে হয়েছিল! এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, জলুলা যুদ্ধের সেনাপতি হযরত হাশেম বিন উতবা (রা.) মাদায়েনে ফিরে এসেছিলেন আর হযরত সা'দ (রা.) তখনও মাদায়েনেই অবস্থান করছিলেন। ইতোমধ্যে খবর আসে– একটি ইরানি সেনাদল আযিন বিন হুরমুযানের নেতৃত্বে মুসলমানদের সাথে মোকাবিলার জন্য মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হযরত সা'দ (রা.) এই রিপোর্ট হযরত উমর (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। ফলে হযরত উমর (রা.) এই দিকনির্দেশনা প্রদান করেন যে, যিরার বিন খাত্তাব (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করা হোক যার সম্মুখ সেনাদের নেতৃত্ব থাকবে ইবনে হুযায়েলের হাতে এবং আব্দুল্লাহ বিন ওহাব রাসবি ও মাযারেব বিন ফালাহ ইজলী পার্শ্ব (দুই) সেনাদলের নেতৃত্ব দিবে। ইসলামী সেনাবাহিনী ইরানি সেনাবাহিনীর মোকাবিলার জন্য রওয়ানা হয় এবং মাসাবযানের উন্মুক্ত সমভূমি অঞ্চলের নিকটে শত্রুদের মুখোমুখি হয় আর হানদাফ নামক স্থানে যুদ্ধ সংঘঠিত হয় যাতে ইরানিরা পরাজয় বরণ করে। পরে মুসলমানরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মাসাবযান শহরের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। নগরবাসী শহর ছেড়ে পালিয়ে যায় কিন্তু যিরার বিন খাত্তাব (রা.) তাদেরকে এ আহ্বান জানান যে, তোমরা নিজেদের শহরে এসে শান্তি ও নিরাপদে বসতি স্থাপন কর। তারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং নিজেদের বাড়িঘরে বসবাস করতে আরম্ভ করে। *(তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত ১৯৮৭)*

মাসাবযানের বিজয় সম্পর্কে বালাযুরি বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর একটি রেওয়ায়েত হল আবু মুসা আশারী নাহাওন্দের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে কোন ধরনের যুদ্ধ ছাড়াই এই শহরটি জয় করেছিলেন। *[মাকালা 'তারিখে ইসলাম বেএহ্‌দে হযরত উমর (রা.)' জনাব সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব, পৃষ্ঠা: ১২০] (ফুতুহুল বুলদান, আল্লামা বালাযুরী, পৃষ্ঠা: ১৮৫, দারুল কুতিবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত ২০০০)*

খুজিস্তান ইরানের একটি প্রদেশ, খুজিস্তান বিজয়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হরমুযান ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এই প্রদেশের গভর্ণর ছিল। এই অঞ্চল এবং এখানকার অধিবাসীদের খুজ বলা হত, এর অর্থ খুজিস্তানের অধিবাসী। এটি আহওয়াজের পাশের পারস্য, বসরা, ওয়াস এবং উস্ফাহানের পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা।

১৪ হিজরীতে হযরত উমর (রা.) সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে কতক সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করে ইরাকে স্বল্প পরিসরে দ্বিতীয় একটি ফ্রন্টের সূচনা করেন এবং উতবা বিন গাযওয়ানের নেতৃত্বে একটি ছোট সেনাদল এই স্থানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, যেখানে প্রারম্ভেই এই সেনাবাহিনীর জন্য সেনাছাউনি হিসেবে বসরা শহরের গোড়াপত্তন করা হয়েছিল। এই সেনাদল কেবল আশপাশের শত্রুদের এলাকাই জয় করে নি বরং ইরাকি যুদ্ধাভিযান এভাবে ফলপ্রসূ হচ্ছিল যে, আশপাশের ইরানি সেনাবাহিনী তাদের সঙ্গীসাথীদের বৃহৎ পরিসরে ধারাবাহিক পরাজয় বরণের সংবাদ শোনার পরও তাদেরকে সহযোগিতার জন্য যেতে পারছিল না। মনে হয় এই পথের নিয়ন্ত্রণ নেয়া বা এখানে সেনা স্থাপনের সবচেয়ে বড় যে উদ্দেশ্য ছিল তা হল সেখানে যেন ইরানি সেনাবাহিনীর সহায়ক সেনা এবং সাহায্য ও সহযোগিতা পৌঁছতে না পারে আর তারা যেন মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে না পারে। এই সেনাদলের প্রধান হজ্জ করার জন্য এবং হযরত উমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হিজায ফিরে গিয়েছিলেন আর তার অনুপস্থিতিতে হযরত উমর (রা.) এই সেনাদলের নেতৃত্বের ভার হযরত মুগিরা বিন শো'বা (রা.)-এর ওপর ন্যস্ত করেন। হযরত মুগিরা বিন শো'বার ওপর যখন এক নৈতিক স্খলনের অভিযোগ উঠে তখন এটি তদন্তের জন্য হযরত উমর (রা.) তাকে পদচ্যুত করে মদীনায় নিয়ে এসেছিলেন আর তার স্থলে হযরত আবু মূসা আশারী (রা.)কে কমান্ডার নিযুক্ত করেছিলেন। যাহোক হযরত মুগীরার ওপর যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তদন্তে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। *(তারিখে তাবারী অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩৮-৩৪২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত ১৯৮৭) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃষ্ঠা: ১১৬, যাওয়ার একাডেমী, করাচী ২০০৩) (মো'জেমুল বুলদান, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫৯-২৬০)*

রেওয়ায়েতে ১৬ হিজরী বা ১৭ হিজরীর মাঝে কিছুটা বিরোধ রয়েছে। ১৬ কিংবা ১৭ হিজরী সনে ইসলামী সেনাবাহিনীর ব্যস্ততাও অনেক বেশি ছিল এবং এই যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক ব্যস্ততাও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছিল আর মুসলমানরা খুজিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর আহওয়াজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ঐতিহাসিক তাবারী এটিকে ১৭ হিজরীর ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেই সাথে তিনি এটিও লিখেছেন যে, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিজয়ের বছর ১৬ হিজরী বলে মনে হয়। এই বিজয়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেন, তখন উতবা বিন গাযওয়ানই সেনাপ্রধান ছিলেন, কিন্তু বালাযুরি এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আহওয়াজ এবং এর পরবর্তী বিজয়গুলো হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-এর ফিরে আসার পর হযরত মুগিরা বিন শো'বা এবং হযরত আবু মূসা আশারী (রা.)-এর নেতৃত্বে হয়েছিল। তিনি লিখেন, হযরত মুগীরা আহওয়াজ বিজয় করেন। আহওয়াজের রইস বেহ্‌রুয প্রথমে মোকাবিলা করলেও পরবর্তীতে চুক্তি করে নেয়। কিছু দিন পর যখন হযরত মুগীরার স্থলে আবু মূসা আশারী (রা.) বসরার ইসলামী সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হন তখন রইস বেহ্‌রুয চুক্তি ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করে। এ অবস্থায় হযরত আবু মূসা আশারী (রা.) তাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বের হন এবং যুদ্ধের পর শহরের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। এ ঘটনাটি ১৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

আহওয়াজের যুদ্ধে ইসলামী বাহিনী অনেক লোককে আটক করে দাস বানিয়ে নেয়। কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে সবাইকে মুক্ত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ (ইসলামে) কোন দাসত্ব নেই। যেসব কয়েদী ছিল তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন। স্বাধীন করে দেন। তাবারী লিখেন, এই এলাকায় ইরানিরা দুই পথ দিয়ে মুসলমান বাহিনীর ওপর বার বার আক্রমণ করত। এই দুই পথে 'নাহার তিরা' এবং 'মুনাজের' ছিল ইরানি গেরিলা যোদ্ধাদের কেন্দ্র। এই দুটি জায়গাই মুসলমানরা দখল করে নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই, যেখানে যেখানে মুসলমানদের উত্যক্ত করা হত এবং বার বার আক্রমণ করা হত, সেখানেই মুসলমানরা পরে আক্রমণ করত এবং সেই জায়গা দখল করে নিত। অতএব বালাযুরি লিখেছে, হযরত আবু মূসা আশারী (রা.) 'নাহার তিরা'কে আহওয়াজের সাথে জয় করেন। আহওয়াজ বিজয়ের পর তিনি দ্বিতীয় স্থান, অর্থাৎ মুনাজেরের দিকে অগ্রসর হয়ে শহর অবরোধ করেন আর যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এই অবরোধের সময় এক দিন এক মুসলমান বীর মুহাজের বিন জিয়াদ রোযা রেখে আপন প্রাণ খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মানসে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে বের হন। মুহাজেরের ভাই রাবি সেনাপ্রধান আবু মূসা আশারী (রা.)কে বিষয়টি অবগত করে বলেন, মুহাজের রোযা রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে। একথা শুনে হযরত আবু মূসা (রা.) এ ঘোষণা করিয়ে দেন যে, যারা রোযা রেখেছে তারা হয় রোযা ভেঙ্গে ফেলুক আর না হয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাবে না। মুহাজের এই ঘোষণা শুনে এক ঢোক পানি পান করে ইফতার করেন এবং বলেন, আমীরের আদেশ পালনের জন্যই এমনটি করছি অন্যথায় আমার একদমই তৃষ্ণা ছিল না। একথা বলে অস্ত্র হাতে তুলে নেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। শহরবাসী তার শিরশ্চেদ করে রাজপ্রাসাদের সুউচ্চ মিনারে টাঙিয়ে রাখে। অবরোধ দীর্ঘ হচ্ছিল। হযরত আবু মূসা আশারী (রা.) সম্ভবত হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশেই সেনাবাহিনীর একটি অংশকে মুহাজেরের ভাই রাবির নেতৃত্বে মানাজ অবরোধের জন্য প্রেরণ করেন আর নিজে সূস শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এদিকে রাবি যুদ্ধ করতে করতে শহর দখল করে নেন এবং অনেক লোককে বন্দি করেন, কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে এখানেও সব বন্দিকে মুক্ত করে দেয়া হয়। হযরত আবু মূসা আশারী (রা.) সূসের দিকে অগ্রসর হন। নগরবাসী প্রথমে প্রতিরোধ গড়ে তুলে, কিন্তু যুদ্ধের পর তারা শহরের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। অবশেষে রসদের ঘাটতি দেখা দিলে তারা অস্ত্র সমর্পণ করে।

এসব বিজয়ের ঘটনার বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব তার গবেষণাপত্রে যে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন তা হল, তাবারী ও বালাযুরিতে বেশ কিছু মতভেদ রয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এটি মনে হয় যে, অত্র অঞ্চলে ইরানি নেতাদের চুক্তিভঙ্গের পর বিদ্রোহ করার ফলে মুসলমান সেনাবাহিনীর পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ঘটনাবলী বিভিন্ন রেওয়ায়েতে প্রথমবারের বিজয়ের ঘটনাবলীর সাথে মিলে গুলিয়ে গেছে। *[মাকালা 'তারিখে ইসলাম বেএহদে হযরত উমর (রা.)' জনাব সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব, পৃষ্ঠা: ১২০] (তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত ১৯৮৭) (ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা: ২২৫-২২৬)*

পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তীতে যেসব বিজয় অর্জিত হয়েছিল সেগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু যাহোক এটি তার একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামত।

(এরপর রয়েছে) রামাহুরমুয এবং তুস্তারের যুদ্ধ। ইরানের সম্রাট ইয়াযদাজার্দ জলুলার যুদ্ধের পর ইয়াস্তাখার চলে গিয়েছিল। ইয়াস্তাখারও একটি জায়গার নাম। তখনও সে পরাজয় মেনে নেয় নি, বরং মুসলমানদের মোকাবিলা করার জন্য লোকদের উস্কানী দিচ্ছিল এবং যেখানকার

বিজয়ের কথা আমি উল্লেখ করছি সেই খুযিস্তান এলাকায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়ক সৈন্য প্রেরণের জন্য পূর্ণ চেষ্টা করছিল। অত্র অঞ্চলে যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ ছিল এখানকার এক প্রসিদ্ধ নেতা হরমুযান এর মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা। হরমুযান কাদসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং সেখানে পরাজিত হয়ে নিজ দেশে ফিরে এসেছিল আর এখানে এসে মুসলমানদের ওপর অনবরত অতর্কিত আক্রমণ করে যাচ্ছিল। *[মাকালা 'তারিখে ইসলাম বেএহ্‌দে হযরত উমর (রা.)' জনাব সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব, পৃষ্ঠা: ১২০] (তারিখুত তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭৩-৪৯৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্‌, বৈরুত ২০১২)*

জালূলায় মুসলমানদের বিজয়ের পর ইরানিরা হরমুযান এর নেতৃত্বে রামাহরমুয-এ একত্র হয়। রামাহরমুয-ও খুযিস্তানের পাশেই অবস্থিত এক প্রসিদ্ধ শহর ছিল। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস হযরত উমর-এর নির্দেশে নো'মান বিন মুকাররিনকে সেনাদলের নেতা বানিয়ে কূফা থেকে প্রেরণ করেন আর হযরত আবু মূসা আশআরী-কে বসরা থেকে প্রেরণ করেন এবং বলেন, যখন উভয় সেনাদল একত্র হবে তখন আবু সাবরা বিন রোম তাদের অধিনায়ক হবেন। নো'মান বিন মুকাররিনের বাহিনী সম্পর্কে হরমুযান যখন অবগত হয়, তখন সে (তাদের) মোকাবিলা করে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর হরমুযান পরাজিত হয়ে তুসতার-এ পলায়ন করে। তুসতার-ও খুযিস্তান থেকে এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি বড় শহর; সেই শহরে সে রুদ্ধদ্বার অবস্থান নেয়। হযরত আবু সাবরা-র নেতৃত্বে ইসলামী বাহিনী শহর অবরোধ করে, যা কয়েক মাস পর্যন্ত চলমান থাকে। ইরানি বাহিনী বার বার বাহিরে এসে আক্রমণ করত এবং ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে নিত। এভাবে এই যুদ্ধে আশিটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। শেষ লড়াইয়ে মুসলমানরা প্রচণ্ড আক্রমণ করে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে যখন অবরোধ কঠোর হয়ে যায় তখন দু'জন পারস্যবাসী মুসলমানদের বলে যে, শহর থেকে পানি নিষ্কাশনের পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে শহর জয় করা সম্ভব। অতএব মুসলমানরা (সেই পথে) শহরে প্রবেশ করে।

এ সম্পর্কে 'আখবারুত্ তিওয়াল'-এর প্রণেতা আবু হানিফা দিনাওয়ারি লিখেছেন যে, "মুসলমানদের অবরোধ দীর্ঘায়িত হয়। এক রাতে শহরের এক সম্মানিত ব্যক্তি হযরত আবু মূসা আশআরি-র কাছে আসে আর নিজের পরিবার-পরিজন এবং নিজ সম্পদের নিরাপত্তার বিনিময়ে শহরের দখল নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়তার প্রস্তাব দেয়। হযরত আবু মূসা আশআরী তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। ফুতুহুল বুলদান-এ লেখা আছে যে, সেই ব্যক্তি মুসলমানও হয়ে গিয়েছিল। সেই ব্যক্তি হযরত আবু মূসা আশআরীকে বলে, আমার সাথে কাউকে প্রেরণ করুন যেন আমি তাকে বলে দিতে পারি, অর্থাৎ পথ দেখিয়ে দিতে পারি যে, কীভাবে মুসলমানরা দুর্গে প্রবেশ করতে পারবে। হযরত আবু মূসা আশআরী বনু শা'বান গোত্রের এক ব্যক্তি আশআস বিন অওফকে তার সাথে প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে ছোট একটি নালা দিয়ে গিয়ে একটি সুড়ঙ্গপথে শহরে প্রবেশ করে। সে আশআস বিন অওফ-কে একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দেয় এবং তাকে বলে, 'তুমি আমার পেছনে পেছনে আমার ভৃত্যের ন্যায় চল।' সে তাকে নিয়ে শহরের সবখানে ঘোরাফেরা করে। অতঃপর সে শহরের প্রবেশদ্বারে যায় যেখানে প্রহরীরা ছিল। এরপর সে হরমুযান-এর কাছে যায়, যে কিনা নিজ প্রাসাদের দ্বারে সভার আয়োজন করে বসে ছিল। এই সমস্ত কিছু দেখানোর পর সে তাকে একই পথ দিয়ে ফিরিয়ে আনে। আশআস বিন অওফ ফিরে এসে হযরত আবু মূসা আশআরীকে সবকিছু অবগত করেন। আশআস বিন অওফ বলেন, 'আপনি আমার সাথে দুই শত বীর সৈনিক প্রেরণ করলে আমি প্রহরীদের হত্যা করে প্রবেশদ্বার খুলে দিব আর আপনি বাহির থেকে এসে আমাদের সাথে যোগ দিবেন।' এভাবে আশআস বিন অওফ নিজ সঙ্গীদের নিয়ে উক্ত গোপন পথে শহরে প্রবেশ করেন আর প্রহরীদের হত্যা করে শহরের প্রবেশদ্বার খুলে দেন। মুসলিম বাহিনী 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করে শহরে প্রবেশ করে। হরমুযান সেই ধ্বনি শুনে নিজ দুর্গে গিয়ে পালায় যা সেই শহরের ভেতরেই ছিল। মুসলমানরা দুর্গ অবরোধ করে নেয়। হরমুযান ওপর থেকে দেখে বলে, 'আমার তূণীরে একশ' তির রয়েছে। যতক্ষণ এগুলোর মধ্য থেকে একটি তিরও অবশিষ্ট থাকবে আমাকে কেউ ছুঁতে পারবে না। এরপর আমি যদি বন্দী হই তাহলে আমার বন্দী হওয়া কতই সৌভাগ্যের!' মুসলমানরা বলে, 'তাহলে তুমি কী চাও?' সে বলে, 'আমি এই শর্তে অস্ত্র সমর্পণ করছি যে, আমার সিদ্ধান্ত হযরত উমরের ওপর ছেড়ে দেয়া হবে। হরমুযান অস্ত্র ফেলে দেয় এবং মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। হযরত আবু মূসা আশআরী হরমুযানকে হযরত আনাস বিন মালেক এবং আহনাফ বিন কায়েসের তত্ত্বাবধানে মদিনায় হযরত উমরের সমীপে পাঠিয়ে দেন। যখন সেই কাফেলা মদিনায় প্রবেশ করে তখন তারা হরমুযানকে তার নিজের রেশমী পোশাক পরিধান করায় যার ওপর স্বর্ণের কারুকাজ করা ছিল। অর্থাৎ, যদিও সে বন্দী ছিল, কিন্তু তাকে পোশাক পরিয়ে দেয়, যা অত্যন্ত দামী পোশাক ছিল। তার মাথায় হীরাখচিত মুকুটও পরানো হয়, যেন হযরত উমর এবং (মদিনার) মুসলমানরা তার প্রকৃত রূপ দেখতে পারেন; অর্থাৎ, একথা বোঝানোর জন্য

যে, দেখ, এত বড় একজন নেতাকে আমরা পরাজিত করেছি! এরপর তারা হযরত উমর কোথায় জানতে চাইলে লোকজন বলে, তিনি মসজিদে আছেন। তারা যখন মসজিদে পৌঁছেন তখন হযরত উমর নিজের পাগড়ি মাথার নীচে দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। হরমুযান জিজ্ঞেস করে, উমর কোথায়? মানুষজন বলে, তিনি ঘুমাচ্ছেন। তখন তিনি ছাড়া মসজিদে আর কেউ-ই ছিল না। হরমুযান জিজ্ঞেস করে, তাঁর প্রহরী ও দারোয়ান কোথায়? মানুষজন বলে, তাঁর কোন প্রহরী, লিপিকার, সভাসদ, পারিষদ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। তখন হরমুযান অবলীলায় বলে ওঠে যে, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন নবী হবে! মানুষজন বলে, তিনি নবী না হলেও নবীদের আদর্শে অবশ্যই অধিষ্ঠিত। লোকজনের কথায় হযরত উমর জেগে উঠেন। হযরত উমর জিজ্ঞেস করেন, হরমুযান এসেছে নাকি? মানুষ বলে, হ্যাঁ। হযরত উমর তখন তাকে ও তার পোশাক-পরিচ্ছদ গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেন এবং বলেন, আমি আগুন থেকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। কাফেলার সদস্যরা বলেন, এ হল হরমুযান, তার সাথে কথা বলে নিন। তিনি বলেন, কক্ষনও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ও অলঙ্কারাদি খুলে ফেলছে। তখন তার সব অলংকারাদি ও রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে দেয়া হয়। হরমুযানের সাথে আলাপ আরম্ভ হয়। হযরত উমর তাকে বলেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও প্রতারণার ফল দেখেছ? অর্থাৎ, যেই যুদ্ধ হয়েছিল বা লড়াই চলছিল, তা তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে এবং প্রতারণা করার কারণে হচ্ছিল। সে বলে, অজ্ঞতার যুগে যখন খোদা আমাদের দু'জনের মধ্যে কারও সাথেই ছিলেন না, তখন আমরা তোমাদের ওপর জয়ী ছিলাম। কিন্তু এখন খোদার সাহায্য তোমাদের সাথে রয়েছে, তাই এখন তোমরা জয়ী হয়েছ। অর্থাৎ, হযরত উমরকে হরমুযান এই উত্তর দেয়। হযরত উমর বলেন, অজ্ঞতার যুগে তোমরা এজন্য জয়ী ছিলে যে, তোমাদের মাঝে ঐক্য ছিল এবং আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ ছিল। এটিও একটি বড় কারণ ছিল যে, তোমরা ঐক্যবদ্ধ ছিলে আর আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ ছিল। এরপর হযরত উমর হরমুযানকে প্রশ্ন করেন যে, তুমি বারংবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ; এখন তুমি কী অজুহাত দেখাবে? যেমনটি আমি বলেছি, মুসলমানরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল; কেননা তারা শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে চাইত না। হরমুযান বলে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমি এর উত্তর দেয়ার আগেই আপনি আমাকে হত্যা না করে ফেলেন! হযরত উমর বলেন, ভয় পেয়ো না। তখন হরমুযান পানি চাইলে তার জন্য পুরোনো একটি পাত্রে করে পানি আনা হয়। হরমুযান বলে, আমি পিপাসায় মারা গেলেও এমন পাত্রে পানি পান করব না! অতএব তার জন্য যথোপযুক্ত পাত্রে পানি দেয়া হয়, তখন তার হাত কাঁপতে থাকে। হরমুযান বলে, আমার ভয় হচ্ছে যে, আমি যখন পানি পান করতে থাকব, তখন আমাকে হত্যা করা হবে। হযরত উমর বলেন, যতক্ষণ তুমি পানি পান শেষ না করছ, তোমাকে কোন কষ্ট দেয়া হবে না। একথা শুনে সে পানি মাটিতে ফেলে দেয়। সে খুব চতুর ছিল; সে ভাবল, ঠিক আছে, পানি পান করা যদি শর্ত হয়ে থাকে, মুসলমানরা যেহেতু প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর, অতএব আমি পানি-ই পান করব না। এই ভেবে সে পানি মাটিতে ফেলে দেয়। হযরত উমর বলেন, তাকে আবার পানি দাও এবং তাকে যেন তৃষ্ণার্ত অবস্থায় হত্যা করা না হয়। তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের কারণে শাস্তি তো এটি-ই (অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড) অবধারিত ছিল। হরমুযান তখন বলে যে, আমার পানির তৃষ্ণা পায় নি, আমি তো এভাবে নিরাপত্তা লাভ করতে চাইছিলাম। অর্থাৎ, অবশেষে সে সত্য স্বীকার করে। এরপর হরমুযান ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদিনাতেই বসবাস করতে থাকে। হযরত উমর তার জন্য দুই হাজার মুদ্রা ভাতা নির্ধারণ করেন। *(সীরাত আমীরুল মু'মিনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা আস্‌সালাবী, পৃষ্ঠা: ৪২২-৪২৫, দারুল মা'রেফা বৈরুতে ২০০৭ সনে মুদ্রিত) (আখবারত তিওয়াল, আল্লামা আবু হানীফা দিনুরী, পৃষ্ঠা: ১৮৮-১৯০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত ২০০১) (ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা: ২২৫-২২৬, মুয়াস্‌সাতুল মুয়ারেফ বৈরুত, ১৯৮৭) (মো'জেমুল বুলদান, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা: ৩৪, দারুল সাদের, বৈরুত ১৯৭৭)*

'ইকদুল ফরিদ'-এ লিখা আছে যে, হরমুযানকে যখন বন্দি করে হযরত উমরের কাছে নিয়ে আসা হয়, তখন তিনি (রা.) তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, কিন্তু হরমুযান তা অস্বীকার করে। হযরত উমর (রা.) তাকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। তাকে হত্যা করতে গেলে সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি দয়া করে আমাকে পানি পান করান। হযরত উমর তাকে পানি পান করানোর নির্দেশ দেন। যখন পানির পাত্র তার হাতে দেয়া হয় তখন সে হযরত উমরকে বলে, পানি পান করা পর্যন্ত কি আমি নিরাপদ? হযরত উমর বলেন, হ্যাঁ! এতে হরমুযান পানির পাত্র হাত থেকে ফেলে দেয় আর বলে, তাহলে আপনি আপনার ওয়াদা পূর্ণ করুন। হযরত উমর বলেন, আমি তোমাকে কিছুটা অবকাশ দিচ্ছি। আর দেখব যে, তুমি কী আমল কর। যখন তরবারি তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন হরমুযান বলে, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু,

ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ' । অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই; তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, আর এই (সাক্ষ্যও দিচ্ছি) যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। হযরত উমর হরমুযানকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি পূর্বেই ঈমান আনলে না কেন? এতে হরমুযান বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার আশঙ্কা ছিল, মানুষ যেন একথা না বলে যে, আমি তরবারির ভয়ে মুসলমান হয়েছি, যেহেতু আমার মাথার উপর তরবারি ধরে রাখা হয়েছিল। এরপর হযরত উমর ইরানে সেনাবাহিনী পরিচালনার ব্যাপারে হরমুযানের সাথে পরামর্শ করতেন আর তার পমামর্শ অনুসারে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতেন। *(ইকদুল ফরীদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৪, দারুল আরকাম, বৈরুত ১৯৯৯)*

পরবর্তীতে সে হযরত উমরের উপদেষ্টায় পরিণত হয়েছিল।

এটিও সন্দেহ করা হয় যে, হযরত উমরের শাহাদতের ঘটনায় হরমুযানের হাত ছিল। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই সন্দেহকে সঠিক বলে মনে করতেন না। বস্তুত হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কিসাসের আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর কাছে এক মুসলমানকে নিয়ে আসা হয়, যে চুক্তিবদ্ধ এক কাফেরকে হত্যা করেছিল, যে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা হয়ে গিয়েছিল; অর্থাৎ যার সাথে চুক্তি হয়েছিল, যাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, তাকে হত্যা করেছিল। তিনি (সা.) তাকে হত্যা করার আদেশ দেন আর বলেন, আমি অঙ্গীকার পূর্ণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অঙ্গীকার রক্ষাকারী। যার সাথে চুক্তি হয়েছে তাকে কেন হত্যা করলে– এ কারণে শাস্তিস্বরূপ এক মুসলমানকেও হত্যা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তিবরানী হযরত আলী সর্ম্পকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার এক মুসলমান এক বিধর্মী প্রজাকে হত্যা করে। এতে তিনি সেই মুসলমানকে হত্যার নির্দেশ দেন। কিছু লোক বলে, এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'লা ইয়ুকতালু মু'মিনুন বিকাফিরিন', অর্থ: কোন কাফেরের বিপরীতে কোন মু'মিনকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ হাদিসটি লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত প্রকৃত শব্দমালা হল, 'লা ইয়ুকতালু মু'মিনুন বিকাফিরিন, ওয়ালা যু আহদিন ফি আহদিহী' । উক্ত হাদীসের এই দ্বিতীয় বাক্য 'ওয়া লা যু আহদিন ফী আহদিহী'– এর অর্থকে সুস্পষ্ট করে দেয়; যদি এই হাদীসের অর্থ এটি হয় যে, কোন কাফেরের বিপরীতে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না, তবে 'যু আহদিন'-এর এই অর্থ করতে হবে যে, 'ওয়ালা যু আহদিন বিকাফিরিন', অর্থাৎ, কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকেও কোন কাফেরের বিপরীতে হত্যা করা যাবে না। অথচ এটি কেউ সমর্থন করে না। তাই এখানে কাফেরের অর্থ হল মুহারিব কাফের, সাধারণ কাফের নয়; অর্থাৎ যুদ্ধরত কাফের, কোন সাধারণ কাফের নয়। এজন্যই বলা হয়েছে, বিধর্মী কাফের প্রজাকেও যুদ্ধরত কাফেরের বিপরীতে হত্যা করা যাবে না।

যদি আমরা সাহাবীদের কর্মপদ্ধতি দেখি তবে আমরা দেখতে পাই, সাহাবীরাও অমুসলিম হন্তারককে মৃত্যুদণ্ডই দিতেন। সুতরাং তাবারীর ইতিহাসে কুমাযবান বিন হরমুযান তার পিতার হত্যার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হরমুযান একজন ইরানি সর্দার ও অগ্নি উপাসক ছিল। আর ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর-এর হত্যার ষড়যন্ত্রে সেও অংশ নিয়েছিল বলে সন্দেহ করা হয়। তখন কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই আবেগের আতিশয্যে উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর তাকে খুন করে বসে। তিনি বলেন, ইরানিরা মদীনায় পরস্পর মিলেমিশে থাকত। স্বভাবতই ভিন দেশে গিয়ে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয় তাই এক দিন হযরত উমর (রা.)-এর ঘাতক ফিরোজ আমার বাবার সাথে সাক্ষাত করে এবং তার কাছে একটি খঞ্জর ছিল যার উভয় পাশ ছিল ধারালো। আমার বাবা সেই খঞ্জরটি হাতে নেয় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে যে, তুমি এ দেশে এই খঞ্জর দিয়ে কী কাজ করও? অর্থাৎ এই দেশ তো শান্তিধাম, এখানে এমন অস্ত্রের কী প্রয়োজন? সে উত্তরে বলে, আমি এটি দিয়ে উট ধাওয়াই। তারা যখন পরস্পর বাক্যালাপ করছিল তখন কেউ একজন তাদের বিষয়টি দেখে। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি নিজে হরমুযানকে উক্ত খঞ্জরটি ফিরোজের হাতে তুলে দিতে দেখেছি। হরমুযানের ছেলে বলে, তখন হযরত উমর (রা.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র উবায়দুল্লাহ্ গিয়ে আমার বাবাকে হত্যা করে। (হরমুযানের ছেলে বলে,) হযরত উসমান (রা.) যখন খলীফা হন তখন তিনি আমাকে ডাকেন আর উবায়দুল্লাহ্কে গ্রেফতার করে আমার হাতে তুলে দেন আর বলেন যে, হে আমার পুত্র! এই হল তোমার পিতার হন্তারক আর আমাদের চেয়ে তুমি তাকে হত্যা করার অধিক অধিকার রাখ। তাই তাকে নিয়ে যাও এবং তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কর। আমি তাকে ধরে শহরের বাইরে রওনা হলাম। পথিমধ্যে যার সাথে-ই আমার সাক্ষাত হত, সে-ই আমার সাথে সাথে চলতে থাকত কিন্তু আমার সাথে বিবাদে জড়াত না। তাদের প্রত্যেকে আমার কাছে কেবল এতটুকু মিনতি করছিল যে, তাকে ছেড়ে দাও। অতএব আমি সকল মুসলমানকে উদ্দেশ্য করে বলি যে, তাকে হত্যা করা আমার জন্য বৈধ নয় কি? সবাই বলল, হ্যাঁ! তাকে হত্যা করার অধিকার তোমার

আছে। অন্যদিকে তারা উবায়দুল্লাহ্‌কে তার কৃতকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করতে লাগল। এরপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার কি তোমাদের আছে? তারা উত্তরে বলল, অবশ্যই নেই। পুনরায় তারা উবায়দুল্লাহ্‌কে ভর্ৎসনা করল কেননা সে কোন প্রমাণ ছাড়াই তার পিতাকে হত্যা করেছে। তখন আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকদের মনস্তুষ্টির জন্য তাকে (তথা উবায়দুল্লাহ্‌কে) ছেড়ে দিলাম। এত এত লোক যখন তার জন্য সুপারিশ করল, অনেক প্রশ্নোত্তর যখন হয়ে গেল, তিনি বলেন, তখন আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে এবং ঐ লোকদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। তখন মুসলমানরা এতই আনন্দিত হয়েছিল যে, আমাকে কাঁধে তুলে নিল। আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমি আমার ঘর পর্যন্ত মানুষের কাঁধ ও মাথায় চড়ে পৌঁছে গেলাম আর তারা আমাকে মাটিতে পা লাগাতে দেয় নি।

এই বর্ণনা দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয় যে, সাহাবীদের কার্যপদ্ধতিও এটিই ছিল যে, তারা অমুসলিমের হাত দিয়ে মুসলিম হন্তারকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেন আর এটিও সাব্যস্ত হয় যে, যে অস্ত্র দ্বারাই কেউ মারা যাক না কেন, সে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি পাবে। এমনিভাবে এটিও সাব্যস্ত হয় যে, হন্তারককে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদানের অধিকার কেবল রাষ্ট্র সংরক্ষণ করে। যদিও এখানে এটিও বর্ণিত আছে যে, সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু অমুসলিমও যদি হত তবুও একটু আগে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো দ্বারা এটিই মনে হয় যে, অমুসলিমের হন্তারকের সাথেও তেমনি আচরণ করা হত যেরূপ মুসলমানের হন্তারকের সাথে করা হয়েছে। আর এ বিষয়ে চুক্তি থাকলে তো আর কথাই নেই। এমনিভাবে এটিও প্রতীয়মান হয় যে, হন্তারককে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদানের অধিকার কেবল রাষ্ট্র সংরক্ষণ করে। এক্ষেত্রে আইন নিজ হাতে তুলে নেয়ার সুযোগ নেই, রাষ্ট্র এ কাজ করবে কেননা এই রেওয়ায়েত থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, উবায়দুল্লাহ্ বিন উমরকে হযরত উসমান (রা.)-ই গ্রেফতার করান আর তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য তাকে হরমুযানের পুত্রের হাতে তিনিই তুলে দিয়েছিলেন। হরমুযানের কোন উত্তরাধিকারী তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে নি আর না-ই সে গ্রেফতার করেছিল। হযরত খলীফা সানী (রা.)-এর মতে এস্থলে একটি বিষয়ে সন্দেহ দূর করা আবশ্যক মনে হয় আর তা হল, ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দেয়া উচিত– যেরূপ হযরত উসমান (রা.) করেছিলেন নাকি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার শাস্তি কার্যকর করা উচিত? এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে, এই ঘটনা ছিল ব্যতিক্রম। তাই এটিকে ইসলাম ধর্ম প্রত্যেক যুগের জন্য যেরূপ সমীচীন তদ্রূপ করার নির্দেশ দিয়েছে। যেকোন জাতি নিজ সংস্কৃতি ও সমাজ অনুযায়ী যেটিকে কল্যাণকর মনে করে সেই পন্থাই অবলম্বন করা সমীচীন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই উভয় পন্থাই বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে উপকারী সাব্যস্ত হয়ে থাকে। *(তফসীরে কবীর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৯-৩৬১)*

এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। এখন আমি কতক প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং এরপর তাদের গায়েবানা জানাযাও পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ মোকাররমা প্রফেসর সৈয়্যদা নাসীম সাঈদ সাহেবার যিনি মুহাম্মদ সাঈদ সাহেবের স্ত্রী এবং হযরত আলহাজ্জ হাফেয ডাক্তার সৈয়্যদ শফী সাহেব মুহাক্কেক দেহলভী (রা.)-এর মেয়ে ছিলেন। ৮৮ বছর বয়সে পাকিস্তানে তার ইন্তেকাল হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তার পিতার নাম হযরত আলহাজ্জ হাফেয ডাক্তার সৈয়্যদ শফী আহমদ সাহেব মুহাক্কেক দেহলভী (রা.)। তিনি বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তিনি অতি উত্তম (মুনাযের মুহাক্কেক) বিতার্কিক, গবেষক এবং উন্নত মানের একজন সাহাবী ছিলেন। দিল্লী থেকে ১৬ পত্রিকা তিনি ছেপেছিলেন। হযরত সৈয়্যদ শফী আহমদ সাহেব (রা.) ১২ বছর বয়সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ সূফী, কবি এবং বুযূর্গ খাজা মীর দারদ-এর বংশোদ্ভূত ছিলেন। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মীর নাসের নওয়াব (রা.)-এর আত্মীয়দের একজন ছিলেন। হযরত সৈয়্যদ শফী আহমদ (রা.) সম্পর্কের দিক থেকে হযরত আম্মাজান (রা.)-এর ভাগনে ছিলেন। ১৯৫৭ সালে লাহোরের ছাউনীর সাব-ইঞ্জিনিয়ার মুকাররম মুহাম্মদ সাঈদ আহমদ সাহেবের সাথে মরহুমার বিয়ে হয়। তার মেয়ে খালেদা সাহেবা বলেন, আমার নানী আমার পিতামাতার বিয়ের সময় তাকওয়াকে অগ্রগণ্য রেখেছেন। তিনি কেবল এটি দেখেছেন, ২২-২৩ বছরের একটি ছেলে জামা'তের এমন নেতা যার সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে সেটি একটি মৃতপ্রায় জামা'ত ছিল যার মাঝে প্রাণ সঞ্চার করা হয়েছে আর এই সেবার জন্য সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য হলেন তাদের কায়েদ মুহাম্মদ সাঈদ আহমদ এবং তার ৪-৫ জন সহযোগী। অতঃপর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তার মানবসেবার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, গত বছর বন্যায় তিনি অসাধারণ কাজ করেছেন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি প্রশংসার যোগ্য। হযরত মুসলেহ

মাওউদ (রা.) তার অর্থাৎ সৈয়্যদা নাসীম সাঈদ সাহেবার স্বামীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রেখে নাসীম সাঈদ সাহেবার মা তার সাথে তার বিয়ে করান। সৈয়্যদা নাসীম সাঈদ সাহেবার ৪ পুত্র ও ২ কন্যা রয়েছে। ১৯৫৪ সালে হযরত সৈয়্যদা ছোট আপা (রা.)-এর সাথে তার ধর্মসেবার যাত্রা আরম্ভ হয়। ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬১ বছর এই সেবা অব্যাহত ছিল। আর যেহেতু সাঈদ সাহেব সেনাবাহিনীতে ছিলেন তাই বিভিন্ন শহরে তার ট্রান্সফার হতে থাকত। তিনিও তার সাথে বিভিন্ন শহরে যেতেন এবং সেখানে তার সেবা করার সৌভাগ্য লাভ হয়। তিনি নিজেও অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ও জ্ঞানী মহিলা ছিলেন। তিনি প্রায় ২০টির মত বই লিখেছেন যাতে নবীদের জীবনী রয়েছে। এছাড়া পুণ্যবান বুযূর্গদের বৃত্তান্তমূলক অনেকগুলি পুস্তকও তিনি প্রণয়ন করেছেন। তার মেয়ে হামিদা গাফুর মান্নান লিখেন, আমার মা ইবাদতকারী, জ্ঞানের ওপর আমলকারী, নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত, আত্মত্যাগকারী এবং স্নেহ ও ভালবাসার মূর্তিমান প্রতীক ছিলেন। সর্বদা তাকে বিগলিত চিত্তে দোয়া করতে দেখেছি। তাহাজ্জুদ, নফল এবং ফরয নামাযেও তাকে রীতিমত আমরা মগ্ন দেখতাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত মোট চারজন খলীফার সাথেই তিনি তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং জামা'তের বিভিন্ন সেবা করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছেন। আমার সাথে তার কখনও সাক্ষাত হয় নি কিন্তু পত্রযোগে তিনি সবসময় তার ভালবাসা প্রকাশ করতেন। তার সন্তানেরাও একই কথা লিখেছে আর আমিও দেখেছি, যখনই তার পত্র আসত তাতে অসাধারণ ভালবাসা প্রকাশ পেত। কেবল কথার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং কার্যত দেখতাম যে, খিলাফতের সাথে তার নিষ্ঠা ও ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। তার সন্তানসন্ততিকেও আল্লাহ্ তা'লা এই সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন।

তাঁর বড় পুত্র খালেদ সাঈদ সাহেব বলেন, তিনি আমাদেরকে বলতেন, সদা আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্ক রাখবে আর এই সুসম্পর্ক যেন এমন হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তোমাদের সম্মুখে বন্ধুর মত অবস্থান করেন। মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর সত্যিকার প্রেমবন্ধন ছিল, নিজের তো ছিলই সন্তানদেরকেও এ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং জামা'তের সাথে গভীর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক নিজেও রক্ষা করেছেন এবং সন্তানদেরকেও এ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। খিলাফতের সাথে নিজেও গভীর সম্পর্ক রক্ষা করেছেন পাশাপাশি আমাদেরকেও শিখিয়েছেন। জামা'তের সেবায় সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। শৈশব থেকেই আমাদেরকে নামায-কালাম এবং ইসলামী শিক্ষার ওপর রীতিমত আমল করার ক্ষেত্রে অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করতেন। পথ চলতে চলতে সৃষ্টির সেবা করতেন এবং বলতেন, মানুষের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি কর। মালি কুরবানির দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মালি কুরবানি করার পরেই সংসারের খরচ নির্বাহ কর। প্রত্যহ কুরআন পাঠ করতেন এবং এবিষয়ে আমাদেরকেও উপদেশ দিতেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আর ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে নব আত্মীয়স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল এবং আমাদেরকেও এবিষয়ে উপদেশ দিতেন। দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র (তথা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান) জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। আমাদেরকে বারবার তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের জন্য তাগিদ প্রদান করতেন। জ্ঞানচর্চার বিষয়ে আমাদের উপদেশ প্রদান করতেন আর বলতেন, মুখে সবসময় হাসি রাখবে আর কার অমঙ্গল কামনা করবে না। তার মাঝে অতিথিপরায়ণতা ও অতিথিকে সম্মান করার চারিত্রিক গুণ পরিপূর্ণ ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন এবং তাঁর মর্যাদা উচ্চ করুন; তাঁর সন্তানদের মাঝেও এই পূণ্যকর্মগুলো জীবিত রাখুন। তাঁর সন্তানদেরও এই সৎকর্মগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ জার্মানির দাউদ সুলায়মান বাট সাহেবের; যিনি ৪৬ বছর বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তাঁর প্রপিতামহ হযরত আব্দুল হাকিম বাট সাহেবের মাধ্যমে তাঁদের বংশে আহমদীয়াতের আগমন ঘটে; যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দের মাঝে তাঁর স্ত্রী ছাড়া রয়েছেন এক কন্যা এবং দুই পুত্র। তাঁর স্ত্রী সামীরা দাউদ সাহেবা বলেন, জামা'তের সেবায় তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন আর কীভাবে জামা'তের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করা যায়– তিনি সেই চেষ্টাই করতেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন ধর্মকে সংসারের ওপর প্রাধান্য দানকারী একজন ব্যক্তি। পরিচিতজন সবার মত হল, তাঁর মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকত। তিনি সদকা-খয়রাতের ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রগামী এবং সর্বদা সেবায় প্রস্তুত থাকতেন। এখানে জার্মানিতে বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগে দায়িত্ব পালন করতেন আর তাঁর দলের সদস্যরা লিখেছেন যে, তিনি সানন্দে এবং পরিপূর্ণ দায়িত্ব সহকারে কাজ করতেন এবং তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি প্রতিটি কাজ আরম্ভ করার পূর্বে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

আমিও এটি লক্ষ্য করেছি, তিনি সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ধৈর্য ও সাহসিকতা দান করুন এবং সন্তানদের তাঁর সৎকর্মগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ গোলাম মুস্তফা আওয়ান সাহেবের স্ত্রী সিয়ালকোট নিবাসী যাহেদ পারভীন সাহেবার; যিনি ৬১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তাঁর কন্যা হেবাতুল কালিম সাহেবা; তাঁর পুত্র রাশিয়ার বুশক্রিস্তানে কর্মরত আমাদের মোবাল্লেগ জামিল তাবাসসুম সাহেব বলেন, আমার মা আল্লাহ্‌র ফযলে জন্মসূত্রেই আহমদী ছিলেন, তিনি মূসীয়া ছিলেন। তার মা এবং পিতার দাদা দিওয়ান বখশ্ সাহেবের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াত সূচিত হয়। তিনি বলেন, সাবালক হওয়ার পর থেকে আমি মাকে কখনও তাহাজ্জুদের নামায বাদ দিতে দেখি নি আর সন্তানদেরও সবসময় নসীহত করতেন যে, জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক বজায় রেখ। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের মাঝে রয়েছে এক পুত্র ও চার কন্যা। তাঁর তিনজন জামা'তা ওয়াকফে জীন্দেগী এবং দুই কন্যার মুবাল্লেগের সাথে বিয়ে হয়েছে। নিজেদের পরিবারের সাথে দেশের বাইরে ছিলেন, একারণে শেষ সময় নিজ মায়ের কাছে আসতে পারেন নি, দেখতে পারেননি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার সন্তানাদিকে তার পুণ্যকর্মগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ লন্ডনের রানা আব্দুল ওহীদ সাহেবের যিনি ফয়সালাবাদ জেলার জারনাওয়ালার তহসীল চৌধুরী আব্দুল হাই সাহেব এর পুত্র ছিলেন। তিনিও ২৬ জুন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন এবং আনসারুল্লাহ্ সংগঠনে তিনি অনেক পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন। অধিকন্তু মসজিদ ফজলের সেক্রেটারী যিয়াফত এবং সেক্রেটারী মাল হিসেবে সেবা দান করে আসছিলেন। অনেক পরিশ্রমী কর্মী ছিলেন এবং সানন্দে সকল সেবা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরকে ধৈর্য ও সাহস সঞ্চার করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ বাংলাদেশ জামা'তের সাবেক আমীর মুহাম্মদ আলী সাহেবের। তিনি ৮৪বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তিনি কেন্দ্রীয় এবং দেশীয় জামা'তে বেশ কয়েকটি দায়িত্বে সফল ছিলেন। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর হিসেবে খেদমত করার তৌফিক পেয়েছেন। এছাড়াও সেক্রেটারী রিশতানাতা ও সেক্রেটারী তবলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৩ সাল থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত ঢাকা জামা'তের আমীর হিসেবে সেবা করে যাচ্ছিলেন। তার ইমারতের যুগে বাংলাদেশ জামা'ত অনেক উন্নতি করেছে। বিশেষভাবে জামা'তের জায়েদাদ বিভাগ ও ভবন নির্মাণের অনেক কাজ হয়েছে। কেন্দ্রীয় মিশন হাউজও তিনি নির্মাণ করান। অনুরূপভাবে অনেক মসজিদও নির্মাণ করিয়েছেন। অনেক পুণ্যবান, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, তাহাজ্জুদগুযার, সহানভুতিশীল, দোয়াকারী, মালী কুরবানীতে অধিক অগ্রসরমান ছিলেন। দরিদ্রদের প্রতি খুবই যত্নশীল এবং মানুষের উপকারী সত্তা ছিলেন। খিলাফত প্রেমিক এবং জামা'তের কর্মঠ কর্মী ছিলেন। উত্তরাধিকারীদের মাঝে দুই পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরকেও তার পুণ্যকর্মগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর তাদের সকলের জানাযা গায়েব আমি পড়াব।

*(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২০ আগষ্ট ২০২১, পৃষ্ঠা: ৫-১০)*

*(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)*

১৩ আগস্ট, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

# হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
# খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:

## *আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা*

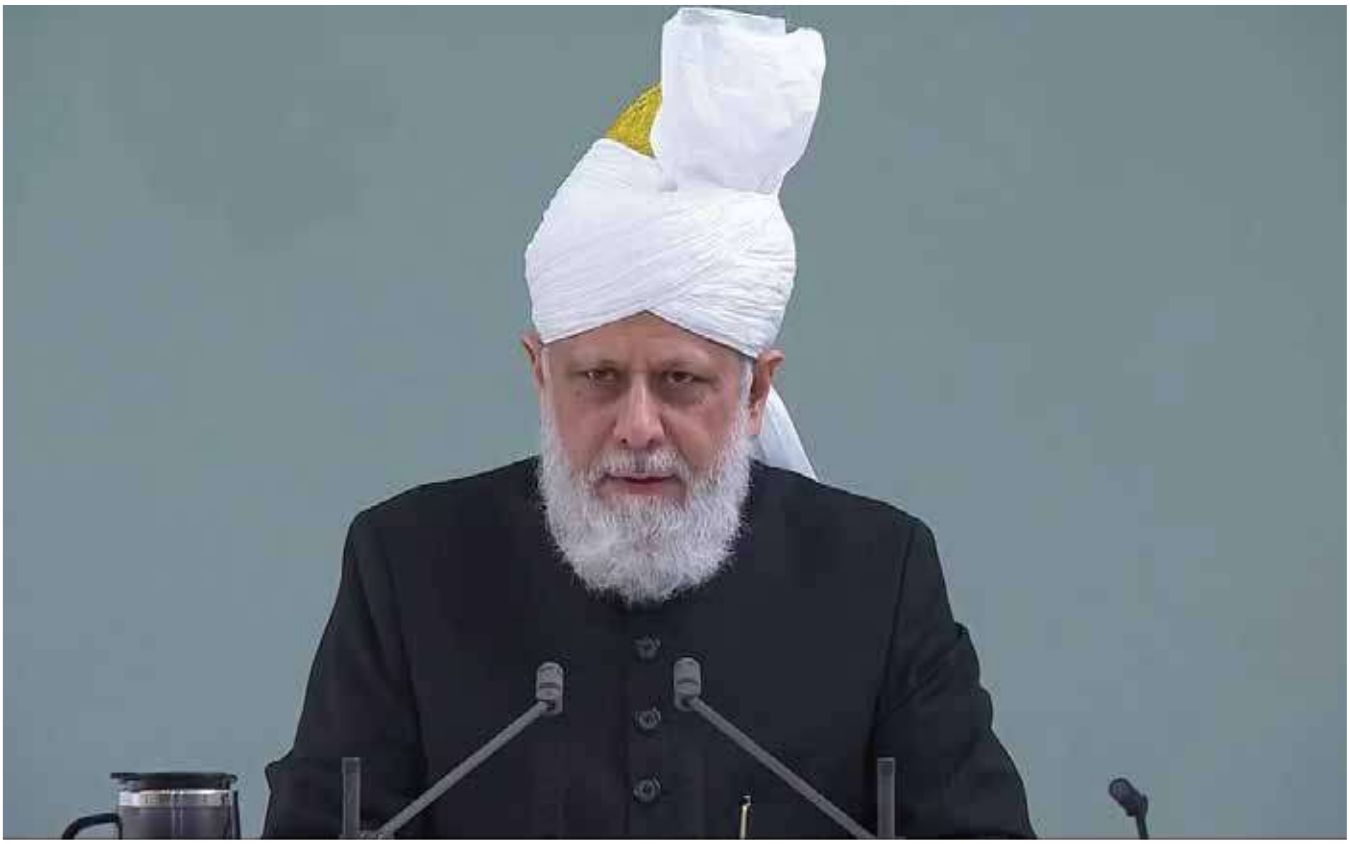

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আলহামদুলিল্লাহ্, বিগত জুমুআয় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা এক বছর বিরতির পর, বরং বলা উচিত দুই বছর পর শুরু হয়ে তিন দিন আধ্যাত্মিক পরিবেশ উপহার দিয়ে গত রবিবার সমাপ্ত হয়েছে। ২০২০ সালে করোনা মহামারির কারণে জলসা করা সম্ভব হয় নি। এছাড়া জলসার ব্যবস্থাপনা কমিটিও ভেবেছিল, পরিস্থিতি যেহেতু অনেকটা একই, তাই এবছরও জলসা হবে না। আর এই ধারণার কারণে প্রস্তুতির দিকেও মনোযোগ ছিল না, যার উল্লেখ আমি গত খুতবায়ও করেছিলাম। কিন্তু তাদেরকে যখন বলা হল যে, জলসা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অনুষ্ঠিত হবে তখন তারা প্রস্তুতি নেয়া আরম্ভ করে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, তারা মন দিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছেন না। আমার শঙ্কা ছিল, ব্যবস্থাপনা যেখানে এমন নিশ্চিন্তভাব, সেখানে কোথাও কর্মীরাও না আবার একই চিন্তাধারা নিয়ে বসে থাকে! কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই আশা ছিল যে, তিনি চাইলে উত্তমরূপে জলসার প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়ে দিবেন আর কর্মীও পাওয়া যাবে। এ পটভূমিতে আমাকে একবার ব্যবস্থাপনাকে কঠোর ভাষায় বলতে হয়েছে যে, আপনারা যদি এমন অমনোযোগী হয়ে কাজ করেন আর মনে করেন যে, 'জানি না জলসা হবে কি হবে না' আর আপনাদের পক্ষ থেকে যদি

নিরাশা প্রকাশ পায় তাহলে আমি নতুন ব্যবস্থাপনা কমিটি নিযুক্ত করছি। মোটকথা আমার এই কথা তাদেরকে একটি ঝাঁকুনি দেয় আর দেরিতে আরম্ভ হলেও দ্রুততার সাথে কাজ শুরু হয়ে যায়। কর্মীবাহিনী এবং স্বেচ্ছাসেবক অর্থাৎ মূল কর্মীবাহিনী, নিম্নপর্যায়ে যারা কাজ করে থাকে, প্রকৃতপক্ষে তারাই মূল জনশক্তি; মনে হচ্ছিল, পূর্ব থেকেই তারা (কাজের জন্য) উন্মুখ। তাৎক্ষণিকভাবে জলসার ব্যবস্থাপনার জন্য চতুর্দিক থেকে স্বেচ্ছাসেবক আসা শুরু হয়। জলসার সময় সেসকল ডিউটি প্রদানকারী কর্মীদের লাইন লেগে যায়। এ জলসা যেহেতু ক্ষুদ্র পরিসরে হওয়ার ছিল তাই কর্মী নির্বাচন করাটা একটি কঠিন কাজ ছিল। যাহোক এর জন্য পুরুষ-মহিলা উভয় পক্ষ কর্মী নির্বাচন করে। লাজনারা সম্ভবত কর্মীর এক পঞ্চমাংশ ডিউটি দেয়ার জন্য বেছে নিয়েছে আর পুরুষরা সম্ভবত কর্মীদের এক তৃতীয়াংশ বাদ দিয়েছে। যারা এ কাজের সুযোগ পায় নি তারা হতাশ হয়েছে। আমি এখানে সর্বপ্রথম ঐ সকল পুরুষ-মহিলা, ছেলে-মেয়ে এবং শিশুদের সম্বোধন করে বলতে চাই– 'আল্লাহ্ তা'লা নিয়্যত অনুযায়ী পুরস্কৃত করেন' [শিশুদের বলার উদ্দেশ্য হল, তারাও ডিউটি দিত]। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার যে সদিচ্ছা আপনাদের ছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেছে, যদিও আপনারা সেবা করার সুযোগ পান নি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের নিয়্যতের কারণে প্রতিদান থেকে আপনাদেরকে বঞ্চিত করবেন না। যাহোক, আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে সেবার প্রেরণার জন্য উত্তম প্রতিদান দিন।

দ্বিতীয়ত যারা বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে থাকে, আমার রীতি হল জলসা পরবর্তী জুমুআয় আমি কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকি। বন্ধুরা আমাকে লিখছেন আর পুরো পৃথিবীর যারা আমাকে পত্র লিখে তারা এই স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন। যেখানেই যাদের ডিউটি ছিল, তারা সেখানে নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন। বৃষ্টির কারণে পার্কিং থেকে গাড়ি বের করা এক পর্যায়ে কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। সেখানে স্বেচ্ছাসেবকরা অসাধারণ কাজ করেছেন। আক্ষরিকভাবে কাদা থেকে তুলে বাইরে নিয়ে এসেছে আর এক্ষেত্রে তাদের সাথে কোন কোন সময় অন্য বিভাগের কর্মীরাও যোগ দেয়, যাদের তখন ডিউটি থাকত না। কেউ কেউ আমাকে লিখেছেন যে, আমরাও এ কাজে অংশ নিয়েছি। পরবর্তীতে পার্কিং-এর এই দুরবস্থা দেখে অন্যত্র পার্কিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যাহোক প্রথম আর দ্বিতীয় দিন অথবা দ্বিতীয় দিনের কিছু সময়ে যেসব গাড়ি এসেছিল সেগুলো সেই পার্কিং থেকে বের করা বড় কঠিন কাজ ছিল আর সেই সমস্যা ক্যামেরার চোখ দেখে ফেলে এবং MTA পুরো জগৎকে দেখিয়েও দিয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদী এবং অ-আহমদী যারাই এই দৃশ্য দেখছিলেন, তারা খুব অবাক হয়েছেন। বরং অ-আহমদী ও অমুসলিমরা এই দৃশ্য দেখে বলেছে, আজকের পৃথিবীতে এমন দৃশ্য অবিশ্বাস্য। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হোক বা নিম্নপদস্থ– সবাই গাড়িগুলো কাদা থেকে বের করার জন্য কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। এরাই ঐসকল লোক যারা জিন্নদের মত কাজ করে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকই দান করেছেন।

অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভাগও রয়েছে, যেমন– পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিভাগ, খাদ্য বিভাগ, রান্না বিভাগ ইত্যাদি। এছাড়া জলসার প্রারম্ভে প্রস্তুতিমূলক যেসব কাজ ছিল তা হল, জলসার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তাবু নির্মাণ, ট্র্যাক ইত্যাদি বিছানো অথবা জলসার প্রারম্ভিক যেসব কাজ ছিল তা সম্পাদন করার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে একাধারে স্বেচ্ছাসেবীরা আসতে থাকে। এছাড়া এখন সরঞ্জাম গুটানোর জন্যও তারা কয়েকদিন শ্রম দিচ্ছেন। অতএব এভাবে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এদের সবার কাজ দেখে MTA এবং লাইভ স্ট্রীমিং এর মাধ্যমে যারা জলসা উপভোগ করছিলেন তারা খুব প্রভাবিত হন। আগমনকারী অতিথিরাও কৃতজ্ঞ ছিলেন আর MTA পৃথিবীকে যে দৃশ্য দেখিয়েছে আর অনুষ্ঠান দেখানোর জন্য বা বিভিন্ন দৃশ্য দেখানোর জন্য যেসব প্রোগ্রাম বানিয়েছে, তাতে তারা বেশ শ্রম দিয়েছে। এই দায়িত্ব তারা খুব সুন্দরভাবে পালন করেছে। তারা কেবল পৃথিবীর মানুষকেই জলসা দেখায় নি, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যারা সংঘবদ্ধভাবে জলসা দেখেছে তাদের দৃশ্যও আমাদেরকে জলসাগাহে দেখিয়েছে এবং পুরো পৃথিবীকেও দেখিয়েছে। অতএব জলসার এই কার্যক্রম, অর্থাৎ কর্মীদের প্রারম্ভিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে জলসা চলাকালে যারা কাজ করেছে, এরপর জলসাগাহে অনুষ্ঠিত জ্ঞানগর্ভ ও তরবিয়তী প্রোগ্রাম, বক্তৃতা ইত্যাদি, MTA এমনভাবে দেখিয়েছে যে, পৃথিবীর সকল দেশের আহমদী ও অ-আহমদী দর্শক অবাক হয়েছে এবং কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছে যে, আমরা এমন দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

এটি এক আন্তর্জাতিক ঘরের চিত্র অঙ্কন করেছিল। অতএব আমি পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকল কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, কেননা এমন বিরূপ পরিস্থিতিতে আর তাদের জন্য এক অর্থে হাঙ্গামী সিদ্ধান্ত ছিল, অধিকন্তু চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া, এতদসত্ত্বেও সকলেই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন এবং জলসায় যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যারা জলসা দেখেছে তাদের পক্ষ থেকেও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, কেননা তাদের পক্ষ থেকেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনমূলক পত্র আমার কাছে আসছে।

আমি ভেবেছিলাম, কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আজ আমার ধারাবাহিক খুতবার বিষয় বর্ণনা করব, কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে জলসাসংক্রান্ত ভাবাবেগ এবং জলসা শোনার পর সুখকর ফলাফল, আহমদী এবং অ-আহমদীদের আবেগের অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং পত্র এত বিপুল সংখ্যায় আসছে যে, আমি ভাবলাম স্থায়ী রীতি অনুসারে এবছরও উক্ত ভাবাবেগ এবং কৃপাবারির উল্লেখই আজকের খুতবায় করা উচিত। সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ আমি কয়েকটা নিয়েছি।

এ বছরের অনন্য ব্যবস্থাপনার অধীনে অনুষ্ঠিত জলসা আল্লাহ্ তা'লার কৃপার এমন দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করেছে যার ফলে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করত তাঁর সম্মুখে বিনত না হয়ে পারে না। এমন বিরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের প্রতি কতই না কৃপা করে যাচ্ছেন। লোকজন সাধারণভাবে একটি ঘাটতির কথা উল্লেখ করেছেন যে, এ বছর আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠিত হয় নি যার জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। যাহোক এই অবস্থায় বয়আতের ব্যবস্থা করা কঠিন ছিল, অপারগতা ছিল।

এখন আমি সংক্ষেপে কিছু রিপোর্ট এবং কতিপয় অনুভূতি বর্ণনা করছি। এ বছর প্রথমবার জামা'তগুলো লাইভ স্ট্রীমিংয়ের মাধ্যমে জলসায় যোগ দিয়েছে, অর্থাৎ নিজেদের স্থানে বসে জলসা শ্রবণ করছিল এবং এখানে জলসাগাহে টিভির পর্দায় তাদেরকে দেখা যাচ্ছিল। যুক্তরাজ্যে ৫টি স্থানে সমষ্টিগতভাবে ব্যবস্থা ছিল এবং অন্য কতক দেশে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময়ের পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষ সেখানে বসে জামা'তীভাবে জলসা শুনছিল, যাদের মাঝে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, গুয়াতেমালা, বাংলাদেশ প্রভৃতি জামা'ত। যুক্তরাজ্য ছাড়াও ২২টি দেশে ৩৭টি স্থানে সরাসরি সম্প্রচার এর মাধ্যমে বন্ধুরা জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেছেন। মহিলাদের পক্ষ থেকেও প্রথমবারের মত লাইভ স্ট্রীমিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ কারণে মহিলারাও বিভিন্ন দেশ থেকে অত্যন্ত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করেছে। একটি ধারণা অনুযায়ী মহিলাদের যে সেশন ছিল, তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় ৩০-৩৫ হাজারের কাছাকাছি মহিলা সদস্য উক্ত প্রোগ্রাম দেখেছে এবং শুনেছে। এতে অংশ নেয়া দেশগুলোর মাঝে রয়েছে আমেরিকা, কানাডা, গুয়াতেমালার কোথাও দুই স্থানে, কোথাও তিন স্থানে, কোথাও চার স্থানে কেন্দ্র বানানো হয়েছিল, গিয়ানা, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, মরিশাস, কাবাবীর, ভারত, বুরকিনা ফাসোঁ, ঘানা, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, তানজানিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, সুইডেন, বেলজিয়াম, ফিনল্যান্ড, হল্যান্ড প্রভৃতি।

নাইজারে ঈসা সাহেব নামে এক অ-আহমদী বন্ধু জলসার তিন দিন মিশন হাউজে নিয়মিত আমার বক্তৃতাগুলো শ্রবণ করতে আসেন। তিনি বলেন, পূর্বে আমি শুনেছিলাম, জামা'তে আহমদীয়া ইসলাম বিরোধী এবং তারা মসজিদে টেলিভিশন রেখেছে যা বৈধ নয়। কিন্তু জলসা দেখার পর বুঝতে পারলাম, যদি পুরো মুসলিম বিশ্ব এমন হয়ে যায় যেভাবে আহমদীয়াত ঐক্যবদ্ধভাবে থাকে এবং ইসলামের বাণী প্রচার করছে, তাহলে মুসলমানরা এতটা শক্তিশালী হয়ে যাবে যে, পৃথিবীর কোন শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারবে না। জামা'তে আহমদীয়ায় যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ রয়েছে, যা আমি জলসায় প্রত্যক্ষ করেছি, তা আমার দৃষ্টিতে সত্যতার একটি প্রমাণ।

এরপর জাম্বিয়া থেকে নও মুবাঈন আহমদী সদস্যদের পাশাপাশি কতক অ-আহমদীও জলসা দেখেছে। সেখানে এক স্থানে ৩৫জন অ-আহমদী সমবেত ছিল। এক খ্রিষ্টান শিক্ষক জলসার প্রোগ্রাম শুনে এই অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন যে, আজ আমি জলসার অনুষ্ঠান শুনে অনেক খুশি হয়েছি। আমি ইসলামি শিক্ষার জ্ঞানার্জন করেছি। তিনি আরও বলেন, আমার বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম এবং পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যারা অভাবীদের সাহায্য করে। আমি অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি।

পুনরায় গ্যাবন-এর মোবাল্লেগ ইনচার্জ লিখেন, অমুসলিম এক পুলিশ অফিসার সস্ত্রীক জলসার প্রোগ্রাম দেখতে মিশন হাউজে আসেন। এর পূর্বে জামা'ত সম্পর্কে তেমন আগ্রহ দেখাতেন না। কিন্তু জলসায় লেবাননের এক নব-আহমদীর আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা শুনে জিজ্ঞেস করেন, জলসার পর আমি কীভাবে MTA দেখতে পারব? তখন তাকে বলা হয়, ইউটিউব এর মাধ্যমেও MTA দেখতে পারেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নিজের মোবাইলে ইউটিউবে MTA ফ্রান্স চ্যানেল বের করেন এবং জলসা দেখতে শুরু করেন। তিনি বলেন, এখন আমি এই চ্যানেলে আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে আরও জানতে পারব।

নাইজেরিয়া থেকে একজন অ-আহমদী বন্ধু জলসার অনুষ্ঠান শুনে বলেন, এই জলসার কার্যক্রম দেখে আমি নিশ্চিত হয়েছি, পৃথিবীতে যদি কোন সত্য ফির্কা থেকে থাকে তবে তা হল আহমদীয়া জামা'ত; আমি অনতিবিলম্বে এই ফির্কায় যোগদান করব। একজন অ-আহমদী বন্ধু জলসা সম্পর্কে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, নিশ্চিতভাবে এটি সত্যনিষ্ঠদের জামা'ত; এটি মু'মিনদের জামা'ত। আমি দেখেছি, মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত ছিল; তারা অতিথিবৃন্দের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করছিল। অনুরূপভাবে মহিলাদের উদ্দেশ্যে আমার ভাষণ সম্পর্কে তিনি তার

মুগ্ধতার কথা ব্যক্ত করেন।

জাপানের মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, মুশিমা উসামি সাহেব নামে হিরোশিমার একজন জাপানি অ-আহমদী বন্ধু যিনি আমি যখন হিরোশিমা গিয়েছি সেখানেও উপস্থিত ছিলেন এবং আতিথ্য করেছিলেন আর ২০১৭ সনের শান্তিসম্মেলনেও যোগদান করেছেন, তিনি বলেন, আমি এখন জলসা দেখছি। আজ ০৬ আগস্ট তারিখের খুতবা শুনেও জাপান জামা'তের সেবার কথা মনে পড়ে গেল যে, জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জুমু'আর দিনেই ১০ই আগস্ট ১৯৪৫ ইং তারিখে হিরোশিমায় সংঘটিত পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে কীভাবে আওয়াজ তুলেছিলেন। এটি ছিল হিরোশিমার পক্ষে উত্থিত প্রথম কণ্ঠস্বরগুলোর অন্যতম; এরপর বর্তমান খলীফার হিরোশিমা সফর হয়। তখনকার শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তাও আমার জন্য বিশেষ অর্থবহ। হিরোশিমা দিবসে আজ MTA দেখে প্রথমত আমার ইচ্ছা হল, MTA আফ্রিকার মতই MTA জাপানও যেন অতিসত্তর প্রতিষ্ঠিত হয় আর জলসার পরিবেশ ও বিশ্ববাসীর সমাবেশ দেখে প্রতিনিয়ত আমার মনে এই অনুভূতি জাগে যে, গোটা বিশ্বকে একই মঞ্চে সমবেত করার লক্ষ্যে এবং পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকল্পে আহমদীয়া জামা'তের ভূমিকা কতটা তাৎপর্যপূর্ণ!

লুসাকা জাম্বিয়া থেকে একজন অ-আহমদী বন্ধু বলেন, আজকে আপনাদের খলীফার কাছ থেকে আমি একটি বিষয় শিখেছি, ইসলামে নারীর মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা সংরক্ষিত রয়েছে আর ইসলাম নারীকে বিয়ে-শাদির ক্ষেত্রে নিজের পছন্দমত জীবনসঙ্গী নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার প্রদান করে, অথচ কোন কোন সমাজে জোরপূর্বক বিয়ে-শাদি করিয়ে দেয়া হয় এবং মানবাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। অতঃপর তিনি বলেন, নারী অধিকারের প্রতি জোর তাগিদ প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামই একমাত্র ধর্ম। তিনি বলেন, ইসলাম পুরুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি প্রদানের পাশাপাশি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারেও জোর তাগিদ প্রদান করে যে, যদি ন্যায়বিচার করতে না পার তবে একটি বিয়েই যথেষ্ট। এটি অত্যন্ত সুন্দর ইসলামী শিক্ষা এবং আহমদীয়াত-ই এর পতাকাবাহী।

এরপর নাইজারের তাসাওয়া প্রদেশ থেকে একজন অ-আহমদী বন্ধু মামন গালি সাহেব বলেন, এটি আমার জীবনের প্রথম জলসা ছিল এবং আমি বেশ মুগ্ধ হয়েছি। অন্যান্য মুসলিম ফির্কাগুলো যদি এই আদর্শ ধারণ করে তবে নিশ্চিতভাবে পৃথিবীতে মুসলামানরা উন্নতির সোপান অতিক্রম করবে। এরপর নাইজার থেকে একজন অ-আহমদী প্রকৌশলী উসামা সাহেব বলেন, এতগুলো দেশের প্রতিনিধিত্ব আর মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র থাকা সত্ত্বেও সবাই যে আনুগত্য প্রদর্শন করছিল আর করোনার মত প্রাণঘাতী রোগ সত্ত্বেও এত নিখুঁত ব্যবস্থাপনা সত্যিকার অর্থেই দেখার মত ছিল।

নাইজারের আমীর সাহেব লিখেন, অ-আহমদী মেহমান মরিয়ম সাহেবা বলেন, আজ আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তৃতা শুনে নারীর অধিকার এবং নারীর দায়দায়িত্ব উভয় বিষয়ে প্রকৃত ধারণা পেয়েছি। অন্যথায়, এখানে আফ্রিকায় নারীরা যে হীন জীবনযাপন করছে উন্নত বিশ্বে তা কল্পনা করাও দুষ্কর। আর আপনাদের কর্ম যদি কথার সাথে সামঞ্জস্য রাখে, তিনি লিখেন, যদি আহমদীদের কথা ও কাজে মিল থাকে তাহলে আপনাদের চেয়ে ভাল আমি আর কাউকে দেখি না। অতএব, প্রত্যেক আহমদীকে নিজ নিজ পরিবারে এই শিক্ষার আদর্শও প্রদর্শন করতে হবে। এসব শুধু বক্তৃতার জন্য নয়, বরং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার যে প্রভাব মানুষের ওপর পড়েছে তা যেন প্রতিষ্ঠিতও হয়।

নাইজারের জনৈক অ-আহমদী বন্ধু ফরিদ মূসা সাহেব নারী অধিকার সংক্রান্ত বক্তৃতার প্রশংসা করেছেন। এছাড়া একজন অ-আহমদী মহিলা মরিয়ম ইলিয়াস সাহেবা বলেন, নারীর অধিকার সম্পর্কে যেসব কথা আহমদীয়া জামা'তের ইমাম বলেছেন এগুলো যে ইসলামী শিক্ষা তা জেনে নারী হিসাবে আমি গর্বিত। হায়, এ বিষয়টি যদি সবাই বুঝে যেত তাহলে পৃথিবী জান্নাতে পরিণত হত।

নাইজারের এক অ-আহমদী মহিলা নাফিসা আদমুস বলেন, আমি প্রথমবার আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তৃতা শুনেছি আর আমার কাছে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মহানবী (সা.) নারীদের যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন আজ যদি বিশ্বে কেউ সেই শিক্ষা বাস্তবায়ন করে থাকে তা কেবল আহমদীয়া জামা'তই করছে। অতএব, আমি পুনরায় একথাই বলব যে, প্রত্যেক আহমদী পুরুষের জন্য এটি খুবই চিন্তার বিষয়, নিজেদের আচার-আচরণ নিজ ঘরে সঠিক রাখুন; বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিবেন না।

নাইজারের আমীর সাহেব লিখেন, একজন অ-আহমদী বন্ধু আলহাজ্জ হোসেন সাহেব পেশাগতভাবে একজন ব্যবসায়ী। তিনি খুবই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তাকে যখন জলসায় আমন্ত্রণ জানানো হয় তিনি তা গ্রহণ করেন। জলসা শেষে তিনি বলেন, আমি প্রথাগতভাবে আপনাদের জলসায় এসেছিলাম। ভেবেছিলাম জাগতিক কোন মেলা হবে হয়ত, কিন্তু আমি যখন জলসা শুনা আরম্ভ করি তখন আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই যে, নিয়মিত তিনদিনই আসব। আমাকে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হল, জলসার পরিবেশ। স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ করতে দেখে মনে হয়েছে, এদের হৃদয়ে

এক বিশেষ আবেগ রয়েছে যা তাদেরকে শক্তি যোগাচ্ছে, নইলে বস্তুবাদী লোকদের পক্ষে এটি সম্ভবপর নয়।

গিনি কোনাক্রির মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, কিনিয়ার অঞ্চলের স্থানীয় মোবাল্লেগ সাহেব বলেন, সেই অঞ্চলের মেয়রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এতে তিনি বলেছিলেন যে, আমি অসুস্থ, কিন্তু আমার ছেলে যাবে। সে যখন এসেছে তখন লাজনাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তৃতা শুরু হচ্ছিল। সেখানে বিদ্যুৎ বিভ্রাট লেগেই থাকে আর এখন হল বর্ষাকাল। একবার বিদ্যুত চলে গেলে কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুত থাকে না। তিনি বলেন, অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছিল এমন মহূর্তে বিদ্যুৎ চলে যায়, মেহমানরাও এসে গিয়েছিলেন আর জেনারেটরেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। মোবাল্লেগ সাহেব বলেন, আমরা দোয়া করি যে, আল্লাহ্ তা'লা! জামা'তের সত্যতার জন্য আজকে মোজেযা দেখাও আর বিদ্যুৎ বহাল করে দাও। তিনি বলেন, আমরা আবেগঘন হৃদয়ে দোয়া করি। আমি বক্তৃতার জন্য ডাইসে আসার পূর্বেই বিদ্যুৎ চলে আসে এবং তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মত যুগ মসীহ্‌র অধম দাসদের দোয়া শুনেছেন এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইসলামের সত্যতার জন্য নিদর্শন দেখিয়েছেন যার প্রভাব আমাদের মেহমানদের হৃদয়েও পড়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, বক্তৃতা শেষ হতেই আবার বিদ্যুৎ চলে যায়। তিনিও একই কথা বলেন যে, এত পূর্ণাঙ্গীন বক্তৃতা আমরা কখনও শুনি নি এবং সাধারণ মুসলমানরা জামা'ত সম্পর্কে যে গুজব ছড়িয়ে রেখেছে তা সবই ভ্রান্ত।

ক্যামেরুন থেকে সেখানকার মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, ক্যামেরুনের উত্তরাঞ্চলের মারওয়া শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রামের প্রধান আলহাজ্জ উসমান সাহেব, যিনি অ-আহমদী, তিনি জলসার পুরো কার্যক্রম MTA আফ্রিকার মাধ্যমে দেখে বলেন, আমরা শৈশব থেকে শুনে আসছিলাম যে, ইমাম মাহদী আসবেন, সারা বিশ্ব তাঁকে দেখবে। আজ জলসার কার্যক্রম দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, এই জামা'ত সত্যিই ইমাম মাহদীর জামা'ত যাকে পুরো বিশ্ব এখন দেখছে। অনেক দেশের লোক নিজ নিজ দেশ থেকে MTA'র মাধ্যমে জলসায় যোগ দিয়েছিলেন। তারা আহমদীয়া জামা'তের ইমামকে দেখছিল এবং তাঁর কথাও শুনছিল। আল্লাহ্‌র নবীর ভবিষ্যদ্বাণী আজ আমি পূর্ণ হতে দেখেছি।

মালির আমীর সাহেব জলসার মাধ্যমে বয়আত সম্পর্কে লিখেন, কিতা শহরের একজন শিক্ষক উমর বারী সাহেব ফোন করে বলেন, আমি আহমদী নই, কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধু আমিই নই বরং পরিবারের সকল সদস্য অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে জলসার অনুষ্ঠানাদি শুনেছি আর বিশেষত যখন যুগ-খলীফার কথার মাঝে বিভিন্ন নারা উচ্চকিত করা হত তখন আমাদের ঘরের সকলেই উচ্ছসিত হয়ে আমরাও নারা উত্তোলিত করতাম। উমর বারী সাহেব বলেন, তারা অতিশীঘ্র আহমদীয়া কার্যালয়ে এসে নিজ পরিবারসহ আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবেন, ইনশাআল্লাহ্।

ক্যামেরুনের মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, ক্যামেরুন থেকে প্রধান ইমাম ডাওয়ালা ফারুক সাহেব বলেন, আমি MTA আফ্রিকার মাধ্যমে জলসার বিভিন্ন বক্তৃতা শুনেছি। এই জামা'তকে মানুষ কাফের বলে এবং জঙ্গী সংগঠন বলে। স্টেজের পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে বড় অক্ষরে লেখা খাতামান্নাবীঈন-এর আয়াতই তাদের আপত্তির উত্তর ছিল। এখন ইনশাআল্লাহ MTA'র মাধ্যমে জামা'ত সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণার অপসারণ হবে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, আরোশা রিজিওন থেকে এক অ-আহমদী বোন জাবু সাহেবা বলেন, এই প্রথমবার আমি জলসা সালানা দেখেছি। এত শান্তিপূর্ণ জনসমাবেশ আমি আমার সারা জীবনে কখনও দেখি নি। সাধারণত জনসমাবেশে মানুষ হৈচৈ করে এবং মানুষকে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের হাস্যস্কর অনুষ্ঠান করা হয়, কিন্তু এই জলসায় এমন কিছুই ছিল না, বরং প্রতিটি অনুষ্ঠানে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খলীফার প্রতি আহমদীদের ভালবাসার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এরপর ক্যামেরুনের মারওয়া শহরের একজন স্থানীয় প্রধান এসব কার্যক্রম দেখে বলেন, এটি জামাতের শ্রেষ্ঠত্ব যে, এত অধিক ভাষায় জলসা সালানার কার্যক্রমের অনুবাদ হচ্ছে আর মানুষ এ থেকে উপকৃত হচ্ছে। আমি জলসার মাধ্যমে লাভবান হয়েছি আর আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। আর MTA একটি মূর্তিমান বরকত। আমি এখন ক্যাবল সংযোগ নিব এবং নিজ ঘরে বসে MTA উপভোগ করব আর নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করব। এখন অ-আহমদীরাও MTA'র মাধ্যমে প্রভাবিত হয় আর যারা ধর্মীয় খাদ্যভাণ্ডার থেকে উপকৃত হতে চায় তারা এ থেকে উপকৃত হয়। আর আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি করতে হলে এটিই উন্নতির রহস্য। আহমদীদেরও MTA'র প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দেয়া উচিত।

গ্যাবন-এর মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, একজন নবআহমদী লিখেন, সত্যিকার অর্থেই এটি সারা পৃথিবীর জলসা যাতে আমরাও অংশগ্রহণ করেছি এছাড়া অন্যান্য অগণিত দেশ থেকেও মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছে। এ বিষয়টিও আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করছে। সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে মানুষ জলসায় বসে আছে, এই দৃশ্য কেবল আহমদীয়া জামা'তই উপস্থাপন করতে পারে। অন্যান্য মুসলমানদের পক্ষে এটি সম্ভবই নয়।

জাম্বিয়ার পূর্ব প্রদেশের লুসাঙ্গাযী শহরের নওমোবাঈন আলী সাহেব নিজ এলাকার আঞ্চলিক প্রধানও বটে। তিনি

বলেন, আমরা খ্রিষ্টধর্ম থেকে আহমদী হয়েছি এবং আমাদের গ্রামে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর অনেকবার অ-আহমদী আলেমগণ আমাদের এলাকায় আসে এবং আমাদের হৃদয়ে আহমদীয়াত বিরোধী সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। যতদিন খ্রিষ্টান ছিলাম ততদিন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে আসে নি। যেইমাত্র আহমদী হয়ে গেলাম তখন অ-আহমদী আলেম-উলামা তাদের ধর্ম পরিশুদ্ধ করতে এসে পড়ে। তিনি বলেন, এবার আমরা জলসা সালানা যুক্তরাজ্য সরাসরি দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমরা জীবনে প্রথম এমন সুশৃঙ্খল জলসার দৃশ্য দেখেছি যেখানে এই মহামারি সত্ত্বেও এত সংখ্যক মানুষ যোগ দিয়েছে আর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা নিজেদের ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জলসা দেখার পর আমাদের সকল সন্দেহ ও সংশয়ের নিরসন হয়েছে যে, আহমদীয়াত কোন ছোট দলের নাম নয় বরং একটি আন্তর্জাতিক জামা'তের নাম। যুগ-খলীফা যেভাবে নারী এবং অন্যান্যদের অধিকার সম্বন্ধে ইসলামী শিক্ষামালা উপস্থাপন করেছেন তা আমাদেরকে বিস্মিত করেছে যে, মহিলাদেরও অধিকার রয়েছে, নতুবা আমরা তো আমাদের মহিলাদের কিছুই মনে করতাম না! আমরা এখানে যা কিছু দেখেছি এবং শুনেছি ইনশা'ল্লাহ্ ফিরে গিয়ে তা অন্যদেরও শুনাব যাতে তাদের ঈমান সুদৃঢ় হয় আর আমরা (এর ওপর) আমল করার পূর্ণ চেষ্টা করব।

মালয়েশিয়ার একজন নবাগত আহমদী রুসলি বিন মুপাসুলি সাহেব বলেন, জলসা সালানা যুক্তরাজ্য দেখার সুযোগ পেয়ে আমি খোদা তা'লার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, কেননা আমি আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হওয়ার এবং যুগ-ইমামকে শনাক্ত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমি যুক্তরাজ্যে ছিলাম না, কিন্তু তবুও যুগ-খলীফাকে দেখার ও তাঁর বক্তৃতাসমূহ শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত না হলে আমি এসব আশিস বা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যেতাম। তাই আমি ওয়াদা করছি, আমি সর্বদা খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকব।

ব্রাজিলের এক ভদ্রমহিলা প্রিশিলা মারলিন সাহেবা, যিনি কয়েক মাস পূর্বে বয়আত করেছিলেন, তিনি বলেন, আমার সৌভাগ্য যে, আমি প্রথমবারের মত জলসা সালানা দেখার সুযোগ পেয়েছি। ভাষা না জানা সত্ত্বেও আমি অনেক কিছু শেখার ও জানার সুযোগ লাভ করেছি। আমি খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, তিনি আমাকে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন।

গিনি বাসাও জামা'তের মোবাল্লেগ ইনচার্জ লিখেন, গিনি বাসাও জামা'তের কাসিনী নামক একটি দূরাঞ্চল থেকে চারজন লাজনা সদস্যা ৮ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে তাদের নিকটবর্তী জামা'ত মাসরা-তে যুক্তরাজ্য জলসা সালানার অধিবেশন শুনতে উপস্থিত হন। আমার বক্তৃতা শুনে তারা বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা তো পূর্বেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু আজ যুগ-খলীফার বক্তৃতা শুনে বুঝতে পারলাম যে, আমরা কত বড় নেয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলাম! আজ আহমদীয়াতে আমাদের ঈমান ষোলআনা পূর্ণ হয়েছে আর আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বদা যুগ-খলীফার খুতবা শোনার জন্য আমরা আসব। দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে কীরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করছেন!

গিয়ানা থেকে সরাসরি লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে মানুষ জলসায় অংশগ্রহণ করেছিল। একজন নবাগত আহমদী মুজাফ্ফর কিয়ুসী সাহেব বলেন, এটি আমার প্রথম জলসা ছিল এবং এটি আমার জন্য অতীব মহান একটি অভিজ্ঞতা ছিল। বিশেষ করে আহমদী ভাইদের সঙ্গে জলসা দেখতে বসা এবং যুগ-খলীফাকে দেখা ও তাঁর বক্তৃতা শোনা, পুরোটাই আমার জন্য এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। আমি এর পূর্বে কখনও কোন মহিলাকে এত সুন্দর সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করতে শুনি নি। তিনি তিলাওয়াতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমাদের জামা'তের সদস্যরা বিভিন্ন উপশহর ও গ্রাম থেকে জলসা শোনার জন্য এক জায়গায় সমবেত হয়েছিল যার সবই খিলাফত ও আহমদীয়াতেরই কল্যাণরাজি, যা আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তকে দান করেছেন। একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জামা'ত সালানা জলসায় ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়েছে এটি দেখাও একটি বিরাট ব্যাপার ছিল। আমি এমন অনেক দেশ দেখেছি যাদের সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না যে, সেখানেও আহমদীয়া জামা'ত পৌঁছে গেছে। অনুরূপভাবে এটিও দেখেছি যে, কীভাবে জামা'তের সদস্যরা মিলেমিশে জলসার জন্য কাজ করছে। যুক্তরাজ্যের এক ভদ্রলোক যিনি ব্যাংকে চাকরি করেন, তিনি ব্যাংক থেকে ছুটি নিয়ে জলসার জন্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছেন এবং নিজ গাড়িতে ঘুমাচ্ছেন। এসব বিষয় এটি প্রমাণ করে যে, জামা'তের সদস্যদের মাঝে নিষ্ঠা রয়েছে এবং তারা ত্যাগ স্বীকার করছে। বক্তৃতামালা থেকে বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করেছি। এভাবে তিনি স্বীয় আবেগানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

মরিশাসের একজন নবআহমদী সাফওয়ান নায়েক সাহেব লাইভ স্ট্রীমিংয়ের মাধ্যমে প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে এ ধরনের অংশগ্রহণ আমাকে খিলাফতের অধিক সান্নিধ্যে এনেছে। যুগ-খলীফার প্রতিটি কথা আমার হৃদয়ে প্রভাব ফেলছিল। জামা'তের

অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্তে আমি খুবই আনন্দিত। MTA'র অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে অনেক কিছু শিখছি।

অস্ট্রিয়া থেকে আশরাফ জিয়া সাহেব বলেন, ডোনা টিলা সাহেবা এ বছরের প্রারম্ভে বয়আত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, যুগ-খলীফা যা-ই বলেছেন তা আবেগকে উদ্দীপ্ত করছিল। তাঁর বক্তৃতাগুলো চলাকালে আমার অশ্রু ঝরছিল। সত্যিকার অর্থেই ইসলাম জীবনপ্রদ এবং সত্য ও ন্যায়ের পথ। আমার জীবন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ পাল্টে যাচ্ছে। আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট খুবই কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন। ইনি একজন অস্ট্রিয়ান।

জলসায় অংশগ্রহণের পর আহমদীয়াত গ্রহণের অনেক ঘটনা রয়েছে।

আইভেরিকোস্ট থেকে একজন অ-আহমদী বন্ধু হাসান সাহেব বলেন, জলসার তিন দিনের পুরো অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। খুবই ঈমান উদ্দীপক ছিল। তিনি বলেন, মিথ্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তা নিজে নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু সত্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ রীতি অনুযায়ী প্রতিনিয়ত আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি স্বয়ং এর সত্যতার প্রমাণ। তিনি বলেন, সালানা জলসা সমাপ্ত হবার পর আমরা ক'জন বন্ধু একটি রেস্তোরায় আলাপ করছিলাম। একজন অপরিচিত লোক আমাদের কথা শুনে বলে, বর্তমানে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পালনকারী কোন সম্প্রদায় যদি থেকে থাকে তবে তা শুধুমাত্র আহমদীয়া জামা'তই রয়েছে। এটুকু বলে সেই অপরিচিত ব্যক্তি তো চলে যায়, কিন্তু আমাদের কথার সত্যায়ন করে যায় যে, আহমদীয়াত শুধু কথায় নয় বরং বাস্তবিক অর্থেও প্রকৃত ইসলাম পালনকারী। এরপর হাসান সাহেব আমাদের মুয়াল্লেমের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, আমি বয়আত করে আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চাই। এখন আমি বেশিদিন নিজেকে এ সত্য থেকে বঞ্চিত রাখতে পারব না।

কঙ্গো ব্রাযভিলের মোবাল্লেগ ইনচার্য বলেন, গাম্বুমা জামা'তে পুরো তিন দিন টিভি ও রেডিওতে জলসার সব অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের সৌভাগ্য হয়। ঐ অঞ্চলে কেবল একটিই টিভি ষ্টেশন রয়েছে এবং সেটিতে আমাদের জলসার প্রোগ্রাম সম্প্রচারিত হয়। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী চার হাজার লোক জলসা দেখে ও শুনে থাকবে। গম্বুমার আশপাশের ত্রিশটি গ্রাম্য জামা'তও রেডিওর মাধ্যমে সালানা জলসায় অংশ নেয়। ঐ অঞ্চলগুলোতে বিদ্যুতের সংযোগ নেই, তাই মানুষ রেডিওর মাধ্যমে শুনে থাকে।

তিনি এখানে আমার যত বক্তৃতা হয়েছে সেগুলো স্থানীয় ভাষা লাঙ্গালায় যে অনুবাদ হয়েছে তা-ও শুনেছেন। তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, অনুষ্ঠান অত্যন্ত সফল ছিল যার বহিঃপ্রকাশ আপন পর সবাই করেছে। তিন দিনই সর্বত্র জলসা সালানার পরিবেশ বিরাজমান ছিল। যেভাবে জলসায় আয়োজন করা হয় ঠিক সেভাবেই খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জলসা চালাকালীন সময়ে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ১২জন ব্যক্তি বয়আত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক পেয়েছে।

গিনি বাসাও-এর মোবাল্লেগ লিখেছেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অধিকাংশ নবআহমদী আহমদীয়াত গ্রহণের পর নিজ নিজ অঞ্চলে এবং নিজেদের আত্মীয়স্বজনের মাঝে অনেক তবলীগ করছে। যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার কল্যাণময় সময়ে বন্ধুদেরকে যখন জলসার অনুষ্ঠানমালা দেখার আহ্বান জানানো হয় তখন সকল নবআহমদী সদস্য তাদের অ-আহমদী আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে জলসায় আমার যে তিন-চারটি বক্তৃতা ছিল সেগুলো শোনার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন, মানুষ ৩০ কিলোমিটার এবং ১৮ কিলোমিটার দূর থেকে সাইকেল চালিয়ে বা পায়ে হেঁটে সেখানে আসে। অধিকাংশ লোক কেবল প্রথম দিনের বক্তৃতা শোনার জন্য এসেছিল, কিন্তু আমার প্রথম দিনের বক্তৃতা শোনার পর তাদের সিদ্ধান্ত বদলে যায় এবং তারা তিন দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর তৃতীয় দিন সমাপনী বক্তৃতা শোনার পর তারা বলে, আপনাদের খলীফা আমাদের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। তিনি যে ইসলাম উপস্থাপন করেছেন সেটিই সত্যিকার ইসলাম। এ উপলক্ষে ১২৭জন নারী ও পুরুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করে। এভাবে সমষ্টিগতভাবেও বয়আত হয়।

কঙ্গো থেকে জামা'তের মুয়াল্লেম ইব্রাহীম সাহেব বলেন, এক খ্রিষ্টান বন্ধু মুক নিগাচিবী সাহেবকে জলসা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তিনি জলসা শোনার পর বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বলেন, জলসার অনুষ্ঠান দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছি আর যে সত্যের আমি অন্বেষণ করছিলাম তা পেয়ে গেছি, তাই এখন আমি বয়আত করতে চাই।

সেনেগাল থেকে জাফর ইকবাল সাহেব লিখেন, আম্বুর রিজিওনে জলসার তিন দিনই আমার বক্তৃতাগুলো চারটি রেডিও এবং একটি টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। একটি রেডিওর সঞ্চালক এসব বক্তৃতা শুনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। সেই সঞ্চালক খুবই শিক্ষিত এবং জনসাধারণের মাঝে অনেক জনপ্রিয়। তিনি বলেন, জামা'ত সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শুনেছিলাম,

কিন্তু আজ আমি জামা'তের ইমামের কথা শুনে প্রকৃত সত্য জানতে পেরেছি। কাজেই আমি আজ আহমদীয়া জামা'তে যোগ দিচ্ছি। সেদিনই তিনি সপরিবারে বয়আত করেন।

ক্যামেরুনের মারওয়ার একজন স্থানীয় ইমাম বলেন, জলসার বিশেষ আকর্ষণ হল জামা'তের ইমামের বিভিন্ন বক্তৃতা। জামা'তের খলীফা প্রতিটি কথা কুরআন ও হাদীস থেকে উপস্থাপন করেন। এটি আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এ জামা'ত এবং খলীফা নিশ্চিতভাবে খোদার পক্ষ থেকে। আমার অন্তর পরিতৃপ্ত। অতএব তিনি তার বন্ধুবান্ধবসহ বয়আত করে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আলেম সম্প্রদায়ের মাঝেও ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে দেখার লোক রয়েছে যারা সত্য দেখলে তা গ্রহণ করে। মালিতে এক অ-আহমদী বন্ধু জলসা দেখার পর (জামা'তের) অন্তর্ভুক্ত হয়। জলসার পূর্বে জামা'তী রেডিওতে জলসা সম্পর্কে অনুষ্ঠান করা হয় এবং প্রতিদিনই রেডিওতে জলসা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিও প্রচারিত হতে থাকে। তারা বলেন, সবাইকে আমরা জলসা দেখার জন্য মিশন হাউজে আসতে আমন্ত্রণ জানাই। অতএব জলসার দিনগুলোতে আহমদী বন্ধুরা ছাড়া অ-আহমদী লোকজনও জলসার সম্প্রচার দেখার জন্য আসে। জলসার শেষ দিন চার ব্যক্তি বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব লোক শিক্ষিত আর তারা বলে, আমরা অনেক দিন থেকে কাই শহরে রেডিও শুনছিলাম আর আহমদীয়াতের প্রতি আমাদের আগ্রহও ছিল। রেডিওতে জলসা সম্পর্কে শোনার পর আমাদের মাঝে এ আগ্রহ জন্মে যে, তাদের জলসা অবশ্যই দেখা উচিত। জলসা দেখার পর তারা বলেন, ইসলামের সফলতা ও উন্নতি কেবল আহমদীয়াতের সাথেই সম্পৃক্ত আর জগতের সামনে আহমদীয়াত যে ইসলাম উপস্থাপন করছে সেটিই প্রকৃত ও সত্যিকার ইসলাম। সবচেয়ে বড় বিষয় হল, মুসলমানদের একজন খলীফা প্রয়োজন যিনি তাদের পথ দেখাবেন। বর্তমান যুগে ইসলামে খিলাফত আহমদীয়াতের মাধ্যমে চালু হয়েছে। তারা আরও বলেন, এখন আমরা পাকা আহমদী আর একজন আহমদীর জন্য মাসিক যে চাঁদা দেয়া আবশ্যক সে সম্পর্কে আমাদের বলুন, ধর্মের সেবার জন্য আমরা প্রতি মাসে চাঁদাও দিব।

মালির আমীর সাহেব লিখেন, কাই রিজিওনের মিশন হাউজে জলসার সম্প্রচার দেখার জন্য অ-আহমদী লোকেরা আসে। জলসার তৃতীয় দিন যখন পুরোনো বিভিন্ন বয়আত (অনুষ্ঠানের) ভিত্তিতে বয়আতের ঈমানোদ্দীপক দৃশ্যসম্বলিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রচারিত হয় তখন একজন শিক্ষিত অ-আহমদী জিজ্ঞেস করে, বয়আত করার শর্তগুলো কী? বিরতির সময় উপস্থিত সবাইকে মুয়াল্লেম সাহেব বয়আতের শর্তগুলো স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে শোনান। এই অ-অহমদী ব্যক্তি বলেন, এগুলো তো ইসলামের সারকথা আর এতে সামাজিক জীবনযাপনের ব্যাপারে উত্তমরূপে দিকনির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন, উত্তমরূপে এগুলোর অনুসরণ করা সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় বিষয়। অতএব জলসা শেষে তিনি বয়আত করেন।

ঘানায় মানুষ লাইভ স্ট্রীমিং-এর মাধ্যমে জলসায় যুক্ত হয়েছিল। বুস্তানে আহমদ আকরার সবুজশ্যামল প্রাঙ্গণে জলসা দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারা বলেন, অভিভূত করার মত খুবই ভাল পরিবেশ ছিল। দুটি স্থানে দুটি বড় বড় পর্দায় নারী ও পুরুষরা জলসার দৃশ্য সরাসরি উপভোগ করছিল। তিন দিনই দুই হাজার পাঁচশতের অধিক নারী ও পুরুষ জলসায় যোগ দেয়। কুমাসি আহমদীয়া সেন্টার মসজিদে বড় পরিসরে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে তিন দিনই দুই হাজারের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। আপার ওয়েস্ট ওয়া-তে ১২টি মসজিদে সম্মিলিতভাবে জলসা সালানার কার্যক্রম শোনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল; অনুরূপভাবে বাদবাকি রিজিওনগুলোতেও (ব্যবস্থা ছিল)। বাস্তবিকপক্ষে ওয়া শহরে ১২টি স্থানে ব্যবস্থা ছিল এবং অবশিষ্ট পুরো রিজিওনে ১৪টি স্থানে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এভাবে এখানেও দুই হাজারের অধিক মানুষ সম্মিলিতভাবে শুনেছে এবং অন্যান্য চ্যানেলেও MTA দেখেছে। MTA আফ্রিকা ও MTA ঘানা ছাড়া ঘানার অন্য তিনটি টিভি চ্যানেলেও জলসার কার্যক্রম দেখা যাচ্ছিল।

ইয়েমেন থেকে আকরাম আলী আল কেহলানী সাহেব বলেন, আজ যুগ-খলীফা এই জলসা এবং বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের মন ও প্রাণকে নতুনভাবে সঞ্জীবিত করেছেন। আমাদের চোখের অশ্রু শুকিয়ে গিয়েছিল যা এখন আবার ফিরে এসেছে আর আমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে যাওয়ার পর আবার কোমল হয়েছে। লাজনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যুগ-খলীফার ভাষণ যদি গোটা সমাজ শোনে এবং যথাযথভাবে তা পালন করে, তবে গোটা সমাজ শতভাগ শুধরে যাবে। তেমনিভাবে সমাপনী ভাষণ জলসার সার্বিক কার্যক্রমের সৌন্দর্যকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। এই পুরো ব্যবস্থাপনার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না। সবার মুখে হাসির ছটা দেখা যাচ্ছিল। এটি সেই খোদার কৃপা যিনি এই জামা'ত বানিয়েছেন।

ইয়েমেন থেকে ইয়ামার আলী সাহেব বলেন, জলসার তিনটি দিনই আমাদের জন্য ঈদ ছিল, যাতে আমরা খোদা তা'লার কৃপারাজি বর্ষিত হতে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে

তাঁর অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ হতে দেখেছি। জলসার কারণে আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি আমাদের ঈমান প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, কেননা আমরা দেখেছি যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন আহমদীয়া খিলাফতের সাথে রয়েছে। খিলাফত ব্যতিরেকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। যদিও আমরা জলসায় সশরীরে উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু আমাদের মন তার সাথেই ছিল আর আমরা জলসার পবিত্র আধ্যাত্মিক পরিবেশ এমনভাবে অনুভব করছিলাম যেন আমরা সেখানেই রয়েছি। তিনি বলেন, তাঁকে দেখে এবং তাঁর উপদেশাবলী শুনে যে আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়; হৃদয়ে অত্যন্ত গভীর প্রভাব পড়ছিল। ভাষণগুলো থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি, কারণ নিজের অনেকগুলো দায়িত্বের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। সেই সাথে অনেক ভুলভ্রান্তির বিষয়েও জানতে পেরেছি যেগুলোর ব্যাপারে আমি উদাসীন ছিলাম। তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশে আহমদীদের একত্র হয়ে জলসায় অংশগ্রহণের দৃশ্য আমার হৃদয়ে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছে এবং আমি দোয়াও করেছি যেন আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত ইয়েমেনেও আমাদেরকে এমন স্থান দান করেন যেখানে আমরা সম্মিলিতভাবে জলসায় অংশগ্রহণ করতে পারব।

জর্ডান থেকে হামিদ সাহেব বলেন, প্রতি বছর পৃথিবীর সব দেশ থেকে মানুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার সাক্ষী হয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করে। এ বছরের জলসা এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল, কেননা এ বছর ইন্টারনেট ও MTA'র মাধ্যমে সারা পৃথিবী থেকে আহমদীরা ব্যাপক সংখ্যায় এতে অংশগ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ তা'লা সর্বাবস্থায়ই জামা'তকে সাহায্য করেন, কেননা এটি এক সত্য জামা'ত। আমি এ বছরের জলসায় যুগ-খলীফার উপস্থিতিকে এক আধ্যাত্মিক দিব্যদর্শন অথবা জাগতিক জান্নাতের সাথে তুলনা করি, যার ফল আমরা এই তিন দিন খেয়েছি। মনে হচ্ছিল যেন খাঁটি ইসলামের প্রচারের জন্য আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিনির্মিত এক ঐশী তাঁবু এটি!

সিরিয়া থেকে মুহাম্মদ বদর সাহেব বলেন, জলসায় আহমদী মুসলমানগণ বর্ণ, গোত্র ও সংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও যুগ-খলীফার নেতৃত্বে জামা'তের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তিনি আরও বলেন, তাদের ক্ষেত্রে খোদা তা'লার এই বাণী যে, যদি তুমি পৃথিবীসম ধনভাণ্ডারও ব্যয় করতে তবুও তাদের হৃদয়গুলোকে এক সুতোয় বাঁধতে পারতে না বরং একমাত্র আল্লাহ্ই তাদের হৃদয়কে এক সুতোয় গেঁথে দিয়েছেন– সত্য সাব্যস্ত হচ্ছিল। এটি পবিত্র কুরআনের আয়াত। অতএব আমাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা। পুনরায় তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণকারীদের মুখমণ্ডল থেকে ভালবাসাপূর্ণ আবেগ উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছিল। তিনি বলেন, জলসায় প্রশান্তি এবং নিরাপত্তার এক গভীর অনুভূতি আমাদের মাঝে কাজ করেছে। এমন মনে হচ্ছিল যেন আমরা সব আহমদী আমাদের আধ্যাত্মিক নেতার আলোতে মরুভূমির মাঝে অবস্থিত কোন আধ্যাত্মিক খেজুর বাগানে অবস্থান করছি যেখানে রয়েছে অনাবিল শান্তি ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। চরমভাবে উপলব্ধি করেছি যে, এখনও আমার মাঝে অনেক দুর্বলতা রয়েছে। তাই আমাকে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে। তাক্বওয়ার উচ্চ মার্গ অর্জন করতে হবে। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। পারিবারিক জীবনকে সুন্দর করতে নারীদের সাথে ভালবাসাপূর্ণ কোমল আচরণ করতে হবে।

জার্মানি থেকে আব্দুর রহমান লুবনানী সাহেব লিখেন, আমি বার্লিনের মসজিদে জামা'তের বন্ধুদের সাথে তিন দিনই জলসা শুনেছি। জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশ অনুভব করেছি। জলসা থেকে আমরা অনেক কল্যাণমণ্ডিত হয়েছি আর আধ্যাত্মিকতার যে ঘটতি অনুভব করছিলাম তা ফিরে এসেছে।

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর থেকে উমর সাহেব বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা হল এই জলসা যেন প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হয় যেন আমরা নবী বা ওলীদের মত হতে পারি। একটি অসাধারণ অনুভূতি ছিল। সব ভাই একত্রে বসে জলসা শুনেছি। ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ একটি পরিবেশ বিরাজ করছিল।

আইভেরিকোস্ট থেকে রিযওয়ান শাহেদ সাহেব লিখেন, মা শহরের জামা'তের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রে সাহেব বলেন, জলসার সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যটি ছিল, খিলাফতের পতাকাতলে সমগ্র বিশ্বের আহমদীরা ঐক্যবদ্ধ এবং খিলাফতের আনুগত্যে মত্ত। কোথাও দিন আবার কোথাও মাঝ রাত হওয়া সত্ত্বেও সবাই যুগ-খলীফার বক্তৃতা শুনতে সর্বান্তঃকরণে কান পেতে বসে আছে এবং নিজেদের ঈমানের সজীবতার উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত।

কিরিগিজস্তানের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইলিয়াস কুরবাতুফ সাহেব লিখেন, জলসায় এমন কিছু বক্তৃতা ছিল যা শুনে আমি আমার আবেগ ধরে রাখতে পারি নি এবং আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। আমি ইউটিউবে জলসা সালানা দেখেছি আর যখন আমি ইউটিউবে আহমদী ভাইবোনদের কমেন্ট দেখছিলাম যেখানে তারা পরস্পরকে জলসার শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল তখন আমার আনন্দের কোন সীমা ছিল না। এছাড়া তারা একে অপরকে শান্তি ও নিরাপত্তার সুসংবাদ

দিচ্ছিল। আমার এসব ভাইবোন বিভিন্ন জাতির লোক ছিল, যেমন– রাশিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, আর্মেনিয়ান, তাতারী, কাজাকী এবং কিরগিজী ইত্যাদি। এই দৃশ্য অত্যন্ত প্রাণোদ্দীপক ছিল।

নাইজারের আহমদী বন্ধু সোলেমান সাহেব বলেন, যুগ-খলীফার বক্তৃতা আমার মাতৃভাষা হাওসায় শুনা আমার জন্য সম্মানের কারণ ছিল। তিনি বলেন, MTA ফাইভে হাওসা ভাষার সংযোজন আমাদের জন্য জলসাকে আরও আড়ম্বরপূর্ণ করে দিয়েছে। আমাদের জন্য জলসা এবং ঈদ এক হয়ে গেছে। তিনি বলেন, যুগ-খলীফাকে হাওসা ভাষায় শোনা একটি জাঁকালো ব্যাপার। যার স্বাদ কেবল একজন হাওসাই বুঝতে পারে। এবার প্রথমবারের মত হাওসা ভাষায় সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া জামা'তের এক বন্ধু সুভিতনু সাহেব বলেন, জলসা দেখার এবং যুগ-খলীফার বক্তৃতাগুলো শোনার পর আমাদের পরিবারে খিলাফতের প্রতি ভালবাসার এক নবচেতনা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধের এক উন্নত দৃষ্টান্ত দেখেছি যা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। খিলাফত সত্যিই রং ও বর্ণের ঊর্ধ্বে গিয়ে মানুষের মাঝে ভালবাসা এবং শান্তির মূর্ত প্রতীক প্রমাণিত হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়া থেকে আতেফ যাহেদ সাহেব বলেন, রাত ১২:৫৫ মিনিটে সরাসরি সম্প্রচার অর্থাৎ (জলসার) উদ্বোধনী ভাষণ আরম্ভ হয়, তবুও লোকেরা সেখানে উপস্থিত হয়ে সম্মিলিতভাবে গভীর মনোযোগের সাথে জলসার কার্যক্রম শোনে। একজন তার ছোট ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন, রাত সাড়ে দশটায় খুতবা শেষ হওয়ার পর তিনি তার ছেলেকে বলেন, তুমি বাড়ি চলে যাও। সে বলে যে, না, আমি এখানে বসেই ভাষণ শুনব, আর সেও (গভীর) রাত পর্যন্ত বসে থাকে। তিনি বলেন, জলসার সমাপনী ভাষণ রবিবার গভীর রাতে আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল আর পরের দিন ছিল কর্মদিবস। তাই দুশ্চিন্তা হচ্ছিল যে, লোকজন হয়ত মসজিদে আসবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের সদস্যরা ব্যাপক সংখ্যায় সমাপনী ভাষণ শোনার জন্য আসেন, বরং উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদানকারীদের চেয়েও এই সংখ্যা বেশি ছিল।

ব্রাজিল থেকে গিনি বাসাউ এর ইব্রাহীম সাহেব, যিনি পড়াশোনার উদ্দেশ্যে ব্রাজিল গিয়েছেন, বলেন, একটি বিষয় যা বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আর আমি বিশেষভাবে যার উল্লেখ করতে চাই তা হল, নিযামে খিলাফত বা খিলাফত ব্যবস্থাপনা; যাঁর অধীনে একই সময়ে বিভিন্ন দেশের মানুষ খুব সুন্দরভাবে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে একত্রে জলসার বক্তৃতামালা এবং কার্যক্রম শুনছিল এবং দেখছিল। এটি একথার প্রমাণ যে, আহমদীয়া জামা'তই ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বকারী জামা'ত। যদি ইমাম মাহদী না আসতেন তাহলে আমাদের মাঝে এই ঐক্য ও একতা সৃষ্টি হত না। আমি এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, এই জলসার মাধ্যমে আমার অনেক জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে আর এই জামা'তের সদস্য হতে পেরে (আমি) খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ।

কিরগিজস্তান থেকে আতাখানু ওয়াদীলিয়ারা সাহেবা বলেন, বক্তাদের বক্তৃতামালা মনোযোগ সহকারে শোনা এবং দেখা কতই না আকর্ষণীয়। যুগ-খলীফার বক্তৃতাগুলো শোনার সময় মানুষ এমন এক জগতে হারিয়ে যায় যেখানে ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটছে। আমরা সবাই একটি পরিবারের মত সম্মিলিতভাবে যুগ-খলীফার বক্তৃতাগুলো শুনছি। বিশেষত লাজনাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যুগ-খলীফার যে ভাষণ ছিল, যাতে ইসলামে নারীর অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। (এই) ভাষণ শোনার পর আমাদের আরও বেশি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হওয়া উচিত যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নারীদের সুরক্ষা করেছেন। তিনি বলেন, (হুযূরের) বিভিন্ন বক্তব্য (আমাদের) গভীরভাবে আবেগাপ্লুত করে।

গুয়াতেমালা থেকে বায়রন সাহেব বলেন, আমার জন্য জলসার দিনটি ছিল একটি বিশেষ দিন, আর এটি কোন মো'জেযার চেয়ে কম নয়; কেননা জলসার কিছুদিন পূর্বে গুয়াতেমালা জামা'তের অগণিত সদস্য করোনা ভাইরাসের কারণে অসুস্থ হয় আর কয়েকজন তো আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু আজ গুয়াতেমালা (জামা'তের) সকল সদস্য এখানে বসে জলসা শুনছেন আর (এখন) কোন সদস্যই অসুস্থ নন। আমি যখন খ্রিষ্টান ছিলাম তখন মো'জেযা সম্পর্কে অলীক বিশ্বাস বা ধারণা ছিল। আহমদীয়া জামা'তে যোগ দেওয়ার পর আমি মো'জেযার সত্যিকার মর্ম বুঝতে পেরেছি যে, সত্যিকার মো'জেযা হল মানুষের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করা। এক বছর পূর্বে আমি একা মসজিদে আসতাম আর আমার পরিবারের ইসলাম গ্রহণ করা ও মসজিদে আসা অসম্ভব মনে হত। (কিন্তু) আজ আমি আমার স্ত্রী-সন্তান, মা এবং সম্পর্কের এক ভাই ও তার পরিবারকেও আমার সাথে নিয়ে এসেছি এবং একসাথে বসে এই জলসা দেখছি আর এটিকে অবশ্যই একটি মো'জেযা বলে বিশ্বাস করি। এই ভদ্রলোক খুবই নিষ্ঠাবান ও সরলপ্রাণ আহমদী। আয়উপার্জন যৎসামান্য হলেও তার মাঝে তবলীগের এক গভীর অনুপ্রেরণা বিদ্যমান রয়েছে। যেখানেই যান তবলীগ করেন

এবং বিভিন্ন লোককে নিজের খরচে মসজিদ পরিদর্শন করান।

গুয়াতেমালা থেকেই রামীরো মাত্রিনিস (সাহেব) বলেন, আমার জন্য আজকের দিনটি খুবই বিশেষ (দিন) ছিল। MTA'র মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের জলসা এবং অন্যান্য স্থানের ভিডিও বা সচিত্র দৃশ্য দেখে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা অবশ্যই ঐশী ব্যবস্থাপনা। যুগ-খলীফা অবশ্যই খোদার পক্ষ থেকে মনোনীত, যিনি আমাদের বলছেন যে, মুসলমানদের কীরূপ চিত্র সমাজের সামনে উপস্থাপন করা উচিত। আমি খুবই আনন্দিত, আগামীতে যুগ-খলীফার বক্তব্য সর্বদা শুনব। এই ভদ্রলোক বিভিন্ন খ্রিষ্টান ফির্কার সদস্য হিসেবে পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ মানুষকে বাইবেল পড়িয়েছেন, কিন্তু সর্বদা মতবিরোধের কারণে এক ফির্কা থেকে অন্য ফির্কায় যোগ দিতে থেকেছেন। (তিনি) স্বয়ং গবেষণা করে ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তার ঘর মসজিদ থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। যখন থেকে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, এর মধ্যে গাড়ি নষ্ট হওয়ার কারণে শুধুমাত্র একটি জুমুআয় আসতে পারেন নি, এছাড়া নিয়মিত জুমুআয় আসেন। নিজের বাড়িতে তিনি পাঁচবেলার নামাযের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

গুয়াতেমালা থেকে আওলীন গনজালীস বলেন, যুক্তরাজ্য জলসায় সরাসরি যোগদান করে জানতে পেরেছি, আহমদীয়া জামা'তের একটি (সুশৃঙ্খল) ব্যবস্থাপনা রয়েছে। সবাইকে এক মালায় গ্রথিত দেখা গেছে আর খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে, তিনি আমাদেরকে এই ব্যবস্থাপনার অংশ হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। আমার দুঃখ হল, যুগ-খলীফার কথা শোনা থেকে বিশ্বের একটি বড় অংশ বঞ্চিত। এ কারণেই বিশ্বে সমস্যাদি ও যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। আমি আহমদীয়াতভুক্ত হয়ে এ বিষয়টি বুঝতে পেরেছি যে, দোয়া দ্বারা সবকিছু হতে পারে আর দোয়ার মাধ্যমে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। যুগ-খলীফার দোয়ার কল্যাণে আমার ধ্বংসপ্রায় সংসার রক্ষা পেয়েছে। এখন আমার কাছে যুগ-খলীফার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মত ভাষা নেই। তিনি বলেন, প্রথমবারের মত যোগদানের কারণে আমি বলতে পারি যে, এটি আমার জন্য সাফল্য ও বিজয়ের বছর। আমরা দুর্বলতামুক্ত নই বা সম্পূর্ণ নই ঠিকই, কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিকতার এক নতুন সফর আরম্ভ হয়েছে। আমি আগামীতেও প্রতি বছর জলসায় যোগদান করব।

নাইজারের আহমদী বন্ধু ঈসা বাবা সাহেব বলেন, ইমাম মাহদী (আ.) কীভাবে নিজের আরামের ওপর অতিথিদের আরামকে প্রাধান্য দিতেন, আমি (হুযূরের) খুতবায় অতিথিসেবা সম্পর্কে শুনেছি। আর খলীফা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, অতিথিদের আরামের জন্য (তিনি) নিজের খাট পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন আর সারা রাত কষ্টে কাটিয়েছেন। এরপর আমি বিরাজমান ভ্রাতৃত্ববোধের অভাবনীয় দৃষ্টান্ত জলসায় দেখেছি। খাদেমরা নিজেদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে কাদায় আটকে পড়া গাড়িগুলোকে বের বা উদ্ধার করছিল। সম্ভবত এরূপ ভ্রাতৃত্বের ঘাটতির কারণেই আজ মুসলমানরা বিশ্বে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ। আর এই সমাধান খলীফাতুল মসীহ্ আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন।

আলবেনিয়া থেকে সামাদ গৌরী সাহেব লিখেন, একজন বন্ধু, ডাক্তার বিয়ার সাহেব বলেন, যুগ-খলীফার বিভিন্ন বক্তব্য ছাড়াও যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার অন্যান্য অনুষ্ঠানও আমি দেখেছি। বর্তমান যুগে মানুষের হেদায়েতের জন্য জলসা সালানা সময়ের একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় দাবি। তিনি বলেন, যুগ-খলীফার বক্তব্যগুলো অত্যন্ত সহজ বাক্যে হলেও বর্তমান যুগ সম্পর্কে এক মহা বার্তাবাহী ছিল। এমন সময়ে যখন সকল প্রকার নৈতিক নিয়মকানুনকে পদদলিত করা হয়েছে বা করা হচ্ছে, যখন এরা বলে যে, মানবাধিকার প্রদান করবে এবং বিশ্বকে রক্ষা করবে, অথচ এরা ভুলে যায় যে, এই নীতি মূলত পনেরশ' বছর পূর্বে মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ আহমদীয়া জামা'ত যার পতাকাবাহী। এবার জলসা সালানায় যেসব দৃশ্য দেখেছি তাতে আফ্রিকার দরিদ্রাঞ্চলগুলোতে আহমদীয়া জামা'ত এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর সেবামূলক (কর্মকাণ্ডের) দৃশ্যাবলী আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সেসব শিশুদের উজ্জ্বল চোখগুলো বাস্তবতার ওপর থেকে এমনভাবে পর্দা উন্মোচনকারী ছিল যে, তাদের সামনে পৃথিবীর বড় বড় নেতাদের বাগাড়ম্বর ও প্রপাগান্ডাও তুচ্ছ। সেসব চোখ জীবনের প্রত্যাশী, আর পানি হল জীবন, যা তারা প্রথমবার অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে আস্বাদন করছিল।

সালানা জলসা উপলক্ষে যেসব শুভেচ্ছাবাণী এসেছে তার মাঝে যুক্তরাজ্য ছাড়াও নয়টি দেশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ১০৯টি শুভেচ্ছাবাণী এসেছে, যেগুলোর মাঝে ভিডিও বার্তা, অডিও বার্তা এবং লিখিত বার্তা অন্তর্ভুক্ত। যুক্তরাজ্য ছাড়া যেসব দেশ থেকে বার্তা এসেছে সেগুলোর মাঝে রয়েছে আমেরিকা, সিয়েরা লিওন, গাম্বিয়া, সেনেগাল, কেনিয়া, স্পেন, হল্যান্ড ও জার্মানি। (বার্তাপ্রেরকদের মাঝে) যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, কানাডার প্রধানমন্ত্রী, এছাড়া যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টির নেতা, যুক্তরাজ্যের লিবডেম পার্টির নেতা, অনুরূপভাবে আরও অনেক রাজনীতিবিদ রয়েছে। এছাড়া আটজন

মন্ত্রী, এগারোজন ছায়ামন্ত্রী, চারজন সাবেক স্টেট সেক্রেটারী, লন্ডনের পুলিশ কমিশনার, ছয়জন জাতীয় পর্যায়ের ধর্মীয় নেতা এবং তেরোজন মেয়রের পক্ষ থেকে বার্তা এসেছে। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন মানুষেরও বার্তা এসেছে।

MTA আফ্রিকার রিপোর্ট হল, বিগত বছরগুলোর ন্যায় এ বছরও MTA আফ্রিকার মাধ্যমে পুরো আফ্রিকাজুড়ে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার সম্প্রচার দেখানো ও শুনানো হয়েছে, যা আমরা মানুষের প্রকাশিত অভিব্যক্তিতেও দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় MTA আফ্রিকা ছাড়াও জলসার সম্প্রচার কতিপয় স্থানীয় টিভি চ্যানেলেও সম্প্রচারিত হয়েছে। এ বছর গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, ঘানা, ইউগান্ডা, মালী, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, সেনেগাল, বুরকিনা ফাসোঁ-য় চৌদ্দটি ভিন্ন ভিন্ন টিভি স্টেশনে আমার বক্তৃতামালা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। এক অনুমান অনুযায়ী (এভাবে) ৫৫মিলিয়নের অধিক মানুষের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছেছে। করোনার কারণে আফ্রিকার বহিরাগত অতিথি যারা জলসায় যোগ দিতে পারে নি, তারাও সেখানে আসে যে, আমাদেরও (ভার্চুয়ালি) অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হোক।

হাওসা ভাষায় প্রথমবার অনুবাদ হয়েছে। আফ্রিকায় পঞ্চাশ মিলিয়নের অধিক মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। আফ্রিকার ১৬টি ভিন্ন ভিন্ন টিভি চ্যানেল যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার বরাতে সংবাদ প্রচার করেছে। এসব চ্যানেলের দর্শক-সংখ্যা ৬০ মিলিয়নের অধিক। ইউগান্ডা থেকে মিশনারী যাকী সাহেব লিখেন যে, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিরোধীরা জলসার পূর্বে জামা'তের বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ করেছিল আর তারা বলছিল যে, তাদের (অর্থাৎ আহমদীদের) নিজস্ব কুরআন রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি, তাই কেউ জলসা শুনবেন না। যখন তারা (অর্থাৎ আহমদীরা) সেখানে বিজ্ঞাপন দেয় যে, জলসা শুনুন, তখন তারা (অর্থাৎ বিরোধীরা) অপপ্রচার আরম্ভ করে যে, জলসা শুনবেন না, কেননা তাদের কুরআন ভিন্ন। এই অপপ্রচারের ফলে ইউগান্ডাতে বহু সংখ্যক মানুষের দৃষ্টি বার্ষিক জলসার দিকে আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ উল্টো প্রভাব পড়ে আর বহু অ-আহমদী ব্যক্তি এ কথা জানিয়েছে যে, জামা'তের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচারের ফলে আমাদের মাঝে জলসা সম্পর্কে জানার আগ্রহ জন্মে আর জলসা দেখার পর আমাদের হৃদয়ে পরিবর্তন এসেছে আর আমরা জানতে পেরেছি যে, আহমদীদের কুরআনও একই, বরং অন্যদের বিপরীতে তারা পবিত্র কুরআনকে বেশি ভালবাসে।

ইউগান্ডার একজন ক্যাথলিক বন্ধু লিখেন, আমি ইউগান্ডার জাতীয় টিভিতে জলসার বিজ্ঞাপন দেখি যে, যুক্তরাজ্যে কোন ইসলামিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে আমি ভাবলাম যে, দেখা যাক তা কেমন সভা। অতএব শনিবার আমি টিভি চালালে সেখানে সাদা পাগড়ী পরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখি যিনি বক্তৃতা করছিলেন। আমি বক্তৃতা শুনতে আরম্ভ করি। তখন টিভির সামনে থেকে উঠতে পারছিলাম না আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো বক্তৃতা শুনি। তিনি বলেন, নারীদের সম্পর্কে (এত সুন্দর) ইসলামী শিক্ষা কোথাও পাওয়া যায় না, আর আমি কোন ব্যক্তিকে নারী-অধিকার সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে দেখি নি। তিনি তখনই পর্দায় দেয়া নাম্বারে যোগাযোগ করেন এবং বলেন, এই বক্তৃতাটির লিখিত কপি আমার চাই, অর্থাৎ মহিলাদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তৃতার স্ক্রিপ্ট প্রয়োজন; তাকে ইনশাআল্লাহ্ তা প্রেরণ করা হবে।

লাইবেরিয়া নিবাসী অ-আহমদী বন্ধু আব্দুল্লাহ্ কোঈ সাহেব বলেন, জলসার অনুষ্ঠান দেখার পেছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল এটি দেখা যে, আহমদী মুসলমান এবং অন্যান্য মুসলমানের মাঝে পার্থক্য কী আর আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে অ-আহমদী আলেমরা যা বলে তার বাস্তবতা কতটুকু। জলসা দেখার পর আমার পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মেছে যে, জামা'তের বিরুদ্ধে কৃত সমস্ত নেতিবাচক অপপ্রচার মিথ্যা। বাস্তবতা হল আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে ইসলামের বাণী সারা বিশ্বে পৌঁছাচ্ছে। আর অন্যদেরও এই বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করাকে আমি আমার দায়িত্ব মনে করি যে, কেবল আহমদীয়া জামা'তই বাস্তবিক পক্ষে ইসলাম ধর্মের প্রচার করছে।

লাইবেরিয়ার এক অ-আহমদী বন্ধু বলেন, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রেরণায় জলসার অনুষ্ঠান দেখার জন্য যোগদান করেছিলাম। যখন আমি স্টেজের পর্দায় লেখা পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ করি তখন এই বিষয়টি আমাকে খুবই অবাক করেছে যে, আহমদীদের সম্পর্কে অ-আহমদী আলেমরা এই কথা ছড়ায় যে, আহমদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মানে না এবং তাঁর (সা.) সম্মান করে না। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর বিপরীতে আহমদীরা তো পুরো পৃথিবীতে মহানবী (সা.)-এর ভালবাসার প্রচার করছে। আর যেভাবে আহমদীয়া জামা'তের খলীফা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর উল্লেখ বার বার নিজের বক্তৃতায় করেছেন– তা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার জ্বলন্ত প্রমাণ।

প্রেস এবং মিডিয়ার মাধ্যমেও, মাঝখানে অন্য বিষয় চলে এসেছিল, যাহোক এখন পুনরায় প্রেস এবং মিডিয়ার উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রেস এবং মিডিয়ার মাধ্যমেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় (ভাল) কভারেজ হয়েছে। বিবিসি তাদের আঞ্চলিক টিভিতে প্রচার করেছে, বিবিসি

সাউথ প্রচার করেছে, একটি প্রমাণ্যচিত্রও তারা দেখিয়েছে, আর এই রিপোর্ট বিবিসি ওয়ার্ল্ডও প্রচার করেছে, যা ২০০টি দেশে দেখা যায়। এছাড়া বিবিসি ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলেও এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে এবং তা পুনঃপ্রচারও হতে থাকে। তারা বলছে যে, কত মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন, কিন্তু এক ধারণা অনুযায়ী এই কভারেজ ৫২ মিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছেছে। চল্লিশটি ওয়েবসাইট জলসার সংবাদ প্রচার করেছে। তাদের নিজস্ব পাঠকসংখ্যা হল ২৭ মিলিয়ন। বিশটি পত্রপত্রিকায় জলসা সম্পর্কে প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এদের পাঠকসংখ্যা হল সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার। জলসার বরাতে ষোলটি রেডিও প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়েছে। (এভাবে) প্রায় ১৬ মিলিয়ন মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। অনুরূপভাবে বারোটি টেলিভিশন চ্যানেল জলসার সংবাদ প্রচার করেছে, যাদের কভারেজ প্রায় বাইশ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে। উক্ত সমস্ত মাধ্যম ছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও আনুমানিক প্রায় তেষট্টি লক্ষ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে।

ঢাকা থেকে বাংলাদেশের আমীর সাহেব বলেন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চট্টগ্রাম থেকে লাইভ স্ট্রীমিংয়ের মাধ্যমে (জলসায়) যোগদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, রিপোর্ট অনুযায়ী ৮০০ এর অধিক অ-আহমদী অতিথি জলসার অনুষ্ঠান দেখেছে এবং উপভোগ করেছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের দশটি অনলাইন পোর্টাল এবং সংবাদপত্রে জলসার সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর মাঝে তিনটি খুবই প্রসিদ্ধ এবং সুপরিচিত। খুবই সতর্ক অনুমান অনুযায়ী অনলাইন পোর্টাল এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে কমপক্ষে চুয়ান্ন লক্ষ মানুষ এসব সংবাদ পাঠ করেছে।

MTA ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে যে কভারেজ হয়েছে তা হল, ইউটিউবে ১৫ মিলিয়নের অধিক মানুষ দেখেছে। ইউটিউবের মাধ্যমে প্রায় পাঁচ লক্ষ ঘণ্টা MTA দেখা হয়েছে। ইন্সটাগ্রামে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ MTA'র পেইজ দেখেছে আর ১.৯৭ মিলিয়ন মানুষের কাছে তা পৌঁছেছে। টুইটারে এক লক্ষের অধিক মানুষ MTA'র পেইজ দেখেছে আর পঁয়ত্রিশ হাজারের অধিক মানুষ তা পছন্দ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছিয়েছে। ফেইসবুক-এর মাধ্যমেও সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। অনুরূপভাবে MTA'র নিজস্ব ওয়েবসাইটও এক লক্ষ বার দেখা হয়েছে। MTA অন ডিমান্ড-এর মাধ্যমেও দুই লক্ষের অধিক মানুষ জলসা দেখেছে।

এই ছিল সংক্ষিপ্ত কিছু কথা, এটিও বেশ সময় নিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই জলসার আরও ইতিবাচক ফলাফলও প্রকাশ করুন আর পুণ্যাত্মাদের আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলামের প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হোক। আর তথাকথিত আলেমদের অনিষ্ট থেকে (আল্লাহ্ তা'লা) জামা'তকে এবং সকল পুণ্যাত্মাকে সুরক্ষিত রাখুন। (আমীন)

*(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)*

কবিতা

*বঙ্গদেশে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের স্মরণে কবিতা*

## "সুরভিত এক ফুল"

**নিলুফার মমতাজ**

বি-বাড়ীয়ার কৃতি সন্তান সুরভিত এক ফুল
নাম তার আব্দুল ওয়াহেদ
"মোফার রাহে আম্বরী" ঔষধ
এনে দিল সত্যের সন্ধান,
হে মহান তুমি চির অম্লান,
বঙ্গ, বিহার, ইউপি ও পাঞ্জাবে
দেখা হল বিখ্যাত আলেমের সাথে
আলাপচারিতার শেষে ধ্যানে মগ্ন তুমি,
শত বাধা পেরিয়ে চলে গেলে কেন্দ্রভূমি কাদিয়ান।
হে মহান তুমি চির অম্লান,
কাদিয়ানে ফিরে.....
তোমার রূহানিয়্যাতের সৌরভ ছড়িয়ে দিলে বঙ্গদেশে
অবগতরে ছড়িয়ে দিলে বঙ্গের কোণে কোণে–
মোহিত করেছ জনপদ ঐশী-সুগন্ধের সুবাতাসে
সব হারিয়ে জ্যোতির্ময় ওয়াহেদ
বুকে ধারণ করেছ মির্যা সাহেবের সত্যতার দাবী
দুঃখকষ্ট মাথায় ধারণ করে
রেখে গেছ সত্যের জ্বলন্ত আদর্শ,
কিংবদন্তী হয়ে আছে ধ্রুবতারা সব তোমার জীবনালেখ্যে।

**********

# সীরাতুল মাহদী (আ.)

*প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)*

ভাষান্তর: **মাওলানা জুবায়ের আহমদ**

*(১০ম কিস্তি)*

৫২) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম: কালহুয়া নিবাসী ঝান্ডা সিং আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, বড় মির্যা সাহেবের নিকট আমার প্রায়ই আসা-যাওয়া ছিল। একবার আমাকে বড় মির্যা সাহেব বললেন, আমার পরিচিত একজন ইংরেজ প্রশাসক এই জেলায় এসেছে যাও গোলাম আহমদকে ডেকে নিয়ে আস। তাঁর মর্জি হলে কোন এক ভাল পদে চাকরির ব্যবস্থা করে দেই। ঝান্ডা সিং বলতেন, আমি মির্যা সাহেবের কাছে গেলে দেখি চতুর্দিকে বইয়ের স্তুপ। আর এর মাঝে বসে তিনি কিছু একটা অধ্যয়ন করছেন। আমি উনার নিকট বড় মির্যা সাহেবের বার্তা পৌঁছে দিলে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব এসে বললেন "আমি তো ভৃত্য হয়েই গেছি"। তখন বড় মির্যা সাহেব বললেন, আচ্ছা! আসলেই কি তুমি ভৃত্য হয়ে গেছ? মির্যা সাহেব বললেন, হ্যাঁ! হয়ে গেছি। এরপর বড় মির্যা সাহেব বললেন, যদি প্রকৃতপক্ষেই ভৃত্য হয়ে গিয়ে থাক তাহলে ঠিক আছে।

খাকসার বর্ণনা করছি যে, কালহুয়া হচ্ছে কাদিয়ানের দক্ষিণে দুই মাইল দুরবর্তী একটি গ্রামের নাম। আর ভৃত্য হওয়া বলতে এখানে আল্লাহ্ তা'লার দাসত্বকে বুঝানো হয়েছে। খাকসার নিবেদন করছি, ঝান্ডা সিং বহুবার এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি কাদিয়ানের বর্তমানের উন্নতি অবলোকনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনেক স্মৃতিচারণ করতেন আর তিনি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অনেক বেশি ভালবাসতেন। যাইহোক, খাকসার বর্ণনা করছি যে, আমাদের দাদাজানকে বংশের মাঝে সবচেয়ে বড় আর সম্মানিত ব্যক্তি হওয়ার কারণে সাধারণভাবেই লোকেরা বড় মির্যা সাহেব বলে ডাকতেন। এভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেও উনার সম্পর্কে সাধারণত এই শব্দই ব্যবহার করতেন।

৫৩) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম: হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অনেক বেশি সদকা দিতেন আর সাধারণত এমন গোপনে দিতেন যে আমিও জানতাম না। খাকসার জিজ্ঞেস করলাম, কতটা সদকা প্রদান করতেন? হযরত আম্মাজান বলেন, প্রচুর সদকা প্রদান করতেন। আর শেষের দিনগুলোতে যে পরিমাণ অর্থই আসত তার এক দশমাংশ সদকার জন্য আলাদা করে রাখতেন আর তা থেকে সদকা দিতেই থাকতেন। আম্মাজান বর্ণনা করেন, এর অর্থ এই নয় যে এক দশমাংশের বেশি প্রদান করতেন না। বরং কখনও কখনও ব্যয় এর আধিক্যের কারণে মানুষ সদকায় কৃচ্ছতা অবলম্বন করে। কিন্তু সদকার অর্থ যদি পূর্বেই আলাদা করে রাখা হয় তাহলে আর কার্পণ্য থাকে না, কেননা সেই অর্থ আর অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় না। হযরত আম্মাজান বলেন, এই কারণেই তিনি (আ.) সম্পূর্ণ অর্থের এক দশমাংশ আলাদা করে রাখতেন। নয়-তো দান করার ক্ষেত্রে তিনি সাধারণত এর চেয়ে বেশি দান করতেন। খাকসার নিবেদন করলাম যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) কি সদকা প্রদানের বিষয়ে আহমদী-গায়ের আহমদীর মাঝে পার্থক্য করতেন ? হযরত আম্মাজান বলেন, না ! বরং প্রত্যেক অভাবীকেই তিনি দান করতেন। খাকসার বর্ণনা করছি, সেই যুগে কাদিয়ানে অভাবী আহমদীর সংখ্যা কমই ছিল।

৫৪) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম: হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কারও কাছ থেকে ঋণ নিলে তা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় কিছুটা বাড়িয়ে দিতেন। খাকসার জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি এই বিষয়ে কোনো ঘটনা মনে আছে? আম্মাজান বলেন, এই মুহূর্তে কোনো ঘটনা মনে পড়ছে না কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের এই নির্দেশনাই প্রদান করেছেন। আম্মাজান বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোনো পুণ্যের ওপর নিজে আমল না করা পর্যন্ত অন্যকে তা করার নসিহত প্রদান করতেন না। খাকসার নিবেদন করলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কি কখনও কাউকে

ঋণ দিয়েছিলেন? হযরত আম্মাজান বলেন, হ্যাঁ ! বহুবার দিয়েছেন। একবার মৌলবী সাহেব (খলীফা আওয়াল) এবং হাকিম ফজল উদ্দীন সাহেব মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। মৌলবী সাহেব (খলীফা আওয়াল) ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য পাঠালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তা ফিরিয়ে দেন আর বলেন, আপনি কি আমার আর আপনার অর্থকে পৃথক মনে করেন! মৌলবী সাহেব তখনই হাকিম ফজল উদ্দীন সাহেবকে বার্তা পাঠায় যে, আমি কিন্তু এই ভুল করে ধমক খেয়েছি। তুমি আবার এই ঋণের অর্থ ফিরিয়ে দিতে যেও না। খাকসার বর্ণনা করছি, আমি এটি অন্য কারও কাছে শুনেছি, মৌলবী সাহেব হেকিম সাহেবকে এটিও বলেছিলেন যে, যদি ঋণের অর্থ ফিরিয়ে দিতেই হয় তাহলে ভিন্ন কোনো পন্থা অবলম্বনে দাও।

৫৫) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম: হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, শেষ বয়সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার আমার সামনে হজ্জে যাওয়ার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অতএব আমি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওফাতের পর উনার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করাই। (হযরত আম্মাজান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে মরহুম হাফেজ আহমদ উল্লাহ সাহেবকে দিয়ে বদলি হজ্জ করিয়েছিলেন) পাশাপাশি হাফেজ সাহেবের সমস্ত ব্যয়ভার হযরত আম্মাজান নিজে বহন করেছেন। হাফেজ সাহেব পুরোনো সাহাবি ছিলেন আর কয়েক বছর পূর্বে তিনি মারা গেছেন।

৫৬) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম: হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) খাবারের মাঝে পাখির মাংস খেতে বেশি পছন্দ করতেন। একটা সময় তিনি তিতির পাখির মাংস খেতেন কিন্তু প্লেগ শুরু হলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই মাংস খাওয়া ছেড়ে দেন। কেননা মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, এই মাংসের মাঝে প্লেগের জীবানু রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মাছ খেতেও পছন্দ করতেন। নাশতায় অনিয়মিত ছিলেন। তবে হ্যাঁ! সকালে অন্ততপক্ষে দুধ পান করতেন। খাকসার জিজ্ঞেস করলাম, দুধ কি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হজম হত? হযরত আম্মাজান বললেন, ঠিকঠাক হজম না হলেও তিনি তা পান করতেন। হযরত আম্মাজান বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পাকোড়া খেতেও পছন্দ করতেন। একটা সময় তিনি প্রচুর লেবুর শরবত পান করতেন কিন্তু পরবর্তীতে তা ছেড়ে দেন। একবার দীর্ঘদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোনো রকম রান্না করা খাবার খান নি, শুধুমাত্র সামান্য দইয়ের সাথে রুটি মাখিয়ে খেয়ে নিতেন। কখনও কখনও ভুট্টার রুটিও খেতে পছন্দ করতেন। খাবার খাওয়ার সময় রুটির ছোট ছোট টুকরা করাতেন। এর কিছু অংশ খেতেন আর কিছুটা রেখে দিতেন। খাবার শেষে তাঁর (আ.)-এর সামনে অনেকগুলো টুকরা অবশিষ্ট রয়ে যেত। একটা সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খুব বেশি চা পান করতেন কিন্তু পরবর্তীতে তা পরিত্যগ করেন। আম্মাজান বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খুব অল্প খাবার খেতেন আর একেবারে নির্দিষ্ট সময় করেও খাবার খেতেন না। কখনও কখনও সকালের নাস্তা ১২টা-১ টার সময় খেতেন। রাতের খাবার সাধারণত মাগরিবের পরপরই খেতেন। আবার কখনও কখনও মাগরিবের পূর্বেই খেয়ে নিতেন, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো সময় ছিল না। কখনও আবার নিজেই খাবার চেয়ে নিতেন আর বলতেন, যদি খাবার প্রস্তুত থাকে তাহলে নিয়ে এস। আমার আবার কাজ শুরু করতে হবে। খাকসার নিবেদন করলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কখন কাজ করতেন? হযরত আম্মাজান বললেন, তিনি তো সারাদিন কাজ নিয়েই থাকতেন। সকাল ১০ টায় ডাক আসলে তিনি ডাকে প্রাপ্ত চিঠিপত্র অধ্যয়ন করতেন। ডাকের কারণে যেন লেখার মাঝে ব্যাঘাত না ঘটে তাই এর পূর্বে তিনি সাধারণত লেখালেখির কাজ শুরু করতেন না। কিন্তু কখনও কখনও এর পূর্বেও শুরু করে দিতেন। খাকসার বলছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রতিদিন লাহোর থেকে প্রকাশিত আখবারে আম পত্রিকা আনিয়ে নিতেন আর নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন। শেষ সময়ে এটি ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকা নিজে আনাতেন না। তবে অন্য কেউ পাঠিয়ে দিলে তিনি তা পড়তেন। ... *(চলবে)*

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

**"পাক্ষিক আহ্‌মদী"** পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক-চাঁদা বাকি পড়েছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক-চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহ্‌মদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন:
**ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

**মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক-চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন।**

ওয়াসসালাম।

খাকসার
**সেক্রেটারী ইশায়াত**
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইজতেমায়

# হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.)-এর সমাপনী বক্তৃতা

*তাং: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং*

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় এ সপ্তাহে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্য ন্যাশনাল ইজতেমার অনুষ্ঠান করছে। কোভিডের কারণে এক বছর ব্যবধানে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। এবছর জলসা সালানা যুক্তরাজ্যের পূর্বে অনেক আহমদী তাদের এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, এবছর জলসা হওয়া উচিত। পরবর্তীতে তারা জলসা সালানার বরকতময় পরিবেশ দেখার সুযোগ পেয়েছে। আপনাদের অনেকেরই খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা সম্পর্কে একই ধরনের অনুভূতি হবে যেমনটা লোকদের জলসা সম্পর্কে ছিল। আর এখন আল্লাহ্ তা'লার ফজলে আপনাদের ইজতেমা হয়ে গেছে বা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অধিবেশনে আপনারা আশা করি তা উপভোগ করে থাকবেন। যা হোক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বুঝতে হবে আর তা হল ইজতেমার প্রধান উদ্দেশ্য শুধু খোদ্দাম এবং আতফালদের সমবেত হওয়া নয় বা কেবল সঙ্গ উপভোগ করা ইজতেমার উদ্দেশ্য নয়। বরং ইজতেমার মূল এবং প্রধান বা সত্যিকারের উদ্দেশ্য হল, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করা। অংশগ্রহণকারীদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে উন্নতি হল ইজতেমার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইজতেমা এমন একটি জায়গা যেখানে এসে আপনারা জাগতিকতাকে বাদ দিয়ে ধর্মের দিকে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পান। আর আপনারা সে সমস্ত বক্তৃতা এবং প্রতিযোগিতা আর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি করার সুযোগ পান। আমি যেভাবে বলেছি আমরা গত মাসে যুক্তরাজ্যে জলসা সালানা করতে পেরেছি। দু'এক বছর ব্যবধানে এ জলসা হয়েছে।

আপনাদের অনেকেই তখন বিভিন্ন বক্তৃতা শুনেছেন বা শুনে থাকবেন। জলসার উদ্দেশ্য ছিল জলসায় অংশগ্রহণকারীদের আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় জ্ঞান যেন বৃদ্ধি পায়। আমি নিশ্চিত, জামা'তের অনেক সদস্য তারা হোক পুরুষ বা নারী, হোক ছোট বা বড়– তারা জলসার বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন। সত্যিকার অর্থে অনেকে আমার কাছে পত্রে লিখেছেন যে, আমার বক্তৃতা এবং আরও কিছু বক্তার বক্তৃতা খুবই জোরালো ছিল এবং তাদের হৃদয়ে তাদের অন্তঃকরণে তাদের মন-মস্তিষ্কে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। জলসা কীভাবে তাদেরকে আধ্যাত্মিক মান উন্নত করার ব্যাপারে এবং তাকওয়ার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছে– তারা অনেকেই আমাকে তা লিখেছে। যেখানে এটি আমাদের জন্য উৎসাহব্যাঞ্জক সেখানে মনে রাখতে হবে যে, এমন আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক পরিবর্তন যেন সাময়িক না হয় আর ধর্মীয় এই পরিবর্তন যেন স্থায়ী হয়। আবারও বলছি, যারা এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন এ ইজতেমাগুলো শুধু সামাজিক বা বিনোদনমূলক কার্যক্রমের জন্য অংশগ্রহণ করেন না। বরং বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন তাদের যে ইজতেমা করে থাকে, এর উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিকভাবে সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা। যে কার্যক্রমগুলো সদস্যদের বয়স অনুসারে এবং বোধ-বুদ্ধির মান অনুসারে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় যেন সদস্যরা তাদের সাথীদের সাথে সময় কাটাতে পারে, তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য চিন্তা করতে পারে, ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যেন প্রণিধান করতে পারে। এগুলো করা হয় বিশেষ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার বিষয়টি মাথায় রেখে, জামা'তের প্রত্যেক অঙ্গসংগঠনের সদস্যরা যেগুলোর সম্মুখীন হয়ে থাকেন। আর সে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার পদ্ধতি যেন তারা শিখতে পারে। এভাবে তারা যেন আল্লাহ্ তালার নির্দেশ সর্বোত্তমভাবে পালন করতে সক্ষম হয়। সকল অঙ্গসংগঠন যে ইজতেমা আয়োজন করে থাকে, উক্ত বিষয়গুলোই ঐসকল ইজতেমার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইজতেমার অনুষ্ঠানের আরেকটি উদ্দেশ্য হল, এটি নিশ্চিত করা যে, সব আহমদী আবালবৃদ্ধবণিতা যেন বুঝে যে, তারা সবাই জামা'তের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি আশা করব এবং দোয়া করব যে, আপনারা ইজতেমার কার্যক্রমে সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং আপনাদের সাধ্যমত প্রতিযোগিতায় অংশ নিবেন। এবছর কিছু সাবধানতার কারণে শুধু ১২ থেকে ১৫ বছরের আতফালদের ইজতেমায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আমি আশা করি ভবিষ্যতে এমন নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হবে। কিন্তু ১২ থেকে ১৫ বছর বয়স্কদের অনুমতি দেয়া আবশ্যক ছিল কেননা ধর্মীয় এবং নৈতিক উন্নতির জন্য এ বয়সটি খুবই গুরুত্ববহ। এছাড়া ধর্মীয় এবং নৈতিক উন্নতির জন্য ইজতেমায় অংশগ্রহণ আবশ্যক। বিভিন্ন কার্যক্রমে এবং প্রোগ্রামে তারা অংশগ্রহণ করে থাকবেন যা তাদের প্রয়োজন সামনে রেখে অনুষ্ঠান করা হয়েছে। আমি আশা রাখি আতফালরা জামা'তের দৃষ্টিতে তাদের যে মর্যাদা আছে বা গুরুত্ব আছে তা বুঝতে পারবে। সত্যিকার অর্থে সকল খোদ্দাম এবং সব আতফালদের বুঝা উচিত যে, তারা জামা'তের খুবই মূল্যবান সদস্য। আর সত্যিকার অর্থে প্রত্যেক আহমদী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই এ মূল্য সুরক্ষিত থাকবে না যদি সাবধান না থাকা হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের সম্মান রক্ষার জন্য আপনাদের সবাইকে অসামান্য ভূমিকা পালন করতে হবে। আর জামা'তের অব্যাহত উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য সবার ভূমিকা পালন করার আছে। চিরন্তন সত্য হল, প্রত্যেক জাতির সব বয়সের যুবকদের জামা'তের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অসাধারণ ভূমিকা পালন করার থাকে। এমন জামা'ত, যাদের শিশুরা এবং যুবকরা সেবা এবং আত্মনিবেদনের প্রেরণায় সমৃদ্ধ থাকে তারাই সাফল্যের চূড়ায় বা চূড়ান্ত মার্গে উপনীত হয়। সত্যিকার অর্থে জামা'তের অব্যাহত উন্নতি ও অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) অঙ্গসংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠা করেছেন যথা: আনসার, লাজনা, খোদ্দাম ইত্যাদি। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছেন, যদি কেন্দ্রীয় জামা'ত এবং অঙ্গসংগঠনগুলো নিজেদের কাজ করতে গিয়ে পুরো শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে লাগায় তাহলে জামা'তের উন্নতি ও অগ্রগতি বা জামা'তের লক্ষ্য দ্রুত অর্জিত হবে। তিনি (রা.) আরও বলেছেন, যদি অঙ্গসংগঠনগুলো প্রহরী হিসেবে কাজ করে এবং এটি নিশ্চিত করে যে জামা'তের উন্নতির গতি যেন থেমে না যায়। কোন দুর্বলতা যদি থাকে বা অলসতা থাকে কেন্দ্রীয় জামা'তের মাঝে থাকে তাহলে অঙ্গসংগঠন জামা'তের চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য পতাকা নিজেদের হাতে বহন করবে। আর এভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের উন্নতি এবং অগ্রগতির সফর অব্যাহত থাকবে। এ কথাগুলো কোন অলীক কথা নয়। আমরা কার্যত এগুলো হতে দেখেছি। যেমন কোন কোন জামা'তের কর্মকর্তা বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে তারা সাবধান হয়ে যায়। বা তাদের আচার-আচরণ অনেক কঠিন হয়ে যায় এবং তারা অতি সাবধান থাকে। সাবধানতা কোন কোন ক্ষেত্রে আবশ্যক। প্রতিটি সিদ্ধান্ত সঠিক সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে নেয়া উচিত। কিন্তু কোন ব্যক্তির

আলস্যকে সাবধানতা নাম দেয়া উচিত নয়। তাই আলস্য যদি কোন পর্যায়ের সদস্যদের ভিতর ঢুকে যায়, কোন সদস্য যদি অলস হয়ে যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের কোন পুরুষ যদি অলস হয়ে যায়, দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অলসতা করে, তাহলে পুরুষের মহিলারা এগিয়ে এসে তারা সক্রিয় হয়ে সেই শূন্যতা দূর করতে পারে এবং তারা অধিক উদ্দীপনা নিয়ে জামা'তের কাজ করতে পারে। খোদ্দামরা যদি দুর্বলতা দেখায় তাহলে তাদের লাজনারা যেন অধিক সক্রিয় হয়ে দায়িত্বপালন করে। আবার যদি লাজনা এবং আনসাররা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে তাহলে খোদ্দামুল আহমদীয়া এগিয়ে আসতে পারে। আল্লাহ্ না করুন, যদি তিন অঙ্গসংগঠনই অলস হয়ে যায় বা দুর্বল হয়ে যায় তাহলে কেন্দ্রীয় প্রশাসন বা প্রেসিডেন্ট বা আমীরের অধিনে কেন্দ্রীয় কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্বে সক্রিয় করবে। আবার অন্যদিকে কেন্দ্রীয় জামা'ত যদি কোন দুর্বলতা দেখায় তাহলে যেসব অঙ্গসংগঠন রয়েছে তারা জামা'তের কাজ যেন সচল থাকে সেটি নিশ্চিত করবে। জামা'তের উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য কেন্দ্রীয় এবং মূল জামা'তের অঙ্গসংগঠনগুলোর সর্বোচ্চ মেধা এবং সামর্থ্য প্রয়োগ করা উচিত। তারা বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেবে যাতে জামা'তের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে থাকে। আর একইভাবে ইসলামের বাণী অন্যদের কাছে পৌঁছানোর কাজও করা উচিত। মূল জামা'ত এবং অঙ্গসংগঠনগুলো যদি এভাবে কাজ করে এবং কাজ করা অব্যাহত রাখে তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জামা'তের উন্নতিকে কোন কিছু বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লক্ষ্য অর্জনের পথে কেউ বাধ সাধতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আমি সবসময় লক্ষ্য করি, যেসব দেশের সকল স্তরের প্রশাসন সক্রিয়, সেখানে জামা'তের উন্নতি এবং অগ্রগতি দ্রুত হয়। আবার অন্যদিকে যেখানে আলস্য দেখায় সেখানে উন্নতির গতি থেমে যায় বা ধীরগতিতে উন্নতি করে। জামা'তের আমেলা সদস্য হোক বা অঙ্গসংগঠনের সদস্য হোক, তাদের সবসময় চিন্তা করা উচিত, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে সফল করার জন্য প্রত্যেকের নিজেদের ভূমিকা রাখতে হবে। আপনাদের সকলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন। আর এই অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়েছেন যে, আপনারা ধর্মকে সমস্ত জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবেন। যদি কাজ করা না হয় তাহলে এমন অঙ্গিকারের কোন অর্থ নেই। তাই আপনাদের সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করে এই অঙ্গিকারকে সত্য প্রমাণ করা উচিত। আপনাদেরকে আমাদের জামা'তের মূল লক্ষ্য সামনে রাখা উচিত। ইসলামের বাণী পৃথিবীর সকল প্রান্তে পৌঁছানো আর শান্তি ভালবাসা এবং ইসলামের শিক্ষা সকল জাতিগোষ্টির মাঝে প্রচার করা আমাদের জামা'তের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য হিসেবে দৈহিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এবং মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আপনারা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছেন। অতএব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নিজেদের ভূমিকা এবং নিজেদের দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে পালন করা জামা'তের সার্বিক সাফল্যের জন্য আবশ্যক। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরা যদি সর্বোচ্চ নৈতিক গুণাবলী ধারণ করে, যদি ধর্মকে প্রাধান্য দেয়, যদি ধর্মীয় জ্ঞান এবং জাগতিক জ্ঞান বৃদ্ধি করে, মোটের ওপর তারা যদি কুরআনের নির্দেশাবলী এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশাবলী মেনে চলে আর যুগ-খলীফার পুরোপুরি অনুগত হয় তাহলে আমাদের জামা'তের উন্নতির গতি অনেক বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের উন্নতি এবং মঙ্গল আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট। আপনাদের অনেকের ছেলে-মেয়ে আছে। নিজস্ব সন্তানও আছে। আর আপনাদের অনেকেই জামা'তের পরবর্তী প্রজন্মের তরবিয়তের জন্য দায়ী। তরবীয়তের দায়িত্ব আপনাদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। পিতার প্রকৃত গুরুত্ব এবং মূল্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রসূল করীম (সা.) বলেছেন, পিতা নিজ সন্তানকে নৈতিকভাবে তরবীয়ত করার চেয়ে মূল্যবান কিছু দিতে পারে না। যদি আপনি সন্তানের জন্য সর্বোত্তম ওসীয়্যত করে যেতে চান তাহলে প্রথমে আপনাকে নিজের প্রতি দেখতে হবে যে, আপনি পুণ্যপন্থা অনুসরণ করছেন কিনা। সন্তানকে যদি তরবীয়ত করতে হয় তবে প্রথমে নিজেকে সর্বোত্তম আদর্শ বানাতে হবে। যে সমস্ত খোদ্দামের বয়স ২৫ থেকে ৪০ বয়সসীমার মধ্যে আছে তাদের মনে রাখতে হবে যে, তারা সরাসরি পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করবে। সম্প্রতি একটি ভার্চুয়াল মোলাকাতে এক খাদেম আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে, যদি বড় খোদ্দামরা সঠিক এবং পুণ্যপন্থা অনুসরণ না করে তাহলে ছোট খোদ্দামরা তাদেরকে কীভাবে গাইড করতে পারে? গত সপ্তাহের আনসারদের ইজতেমাতে আমি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। আজকের ইজতেমায় বলতে চাই, এমন সিনিয়র খোদ্দামদের এ বিষয়টি ভাবা উচিত। বিশেষকরে যাদের সন্তানসন্ততি আছে তাদের জন্য আরও চিন্তার বিষয়। আপনাদের আচার-আচরণ অন্যদেরকে প্রভাবিত করে না– এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। আপনারা কি করছেন তা পরবর্তী প্রজন্ম দেখছে। তাদেরকে আপনারা নিরাশ করবেন না। সবসময় স্মরণ রাখবেন, যদি আপনারা নিজেদের

দায়িত্ব পালনের বিষয়ে এবং আল্লাহ্‌র দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সচেতন না হন এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের বিষয়ে সচেতন না হন, নিজেদের আধ্যাত্মিক মান, ধর্মীয় মান উন্নত করার চেষ্টা না করেন, তাহলে আপনারা শুধু নিজেরাই ক্ষতির সম্মুখীন হবেন না বরং আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মেরও ক্ষতির কারণ হবেন। পরবর্তী প্রজন্ম যদি পথভ্রষ্ট হয় অথবা বিভ্রান্ত হয়, তাহলে আপনারা এর জন্য দায়ী হবেন। রসূল করীম (সা.) বলেছেন, পিতা হলেন ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। পিতা যদি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে তার জবাবদিহি করবেন। সবসময় মনে রাখবেন, মু'মিনকে সবসময় দু'টি অধিকার প্রদান করতে হয়। যার একটি হল আল্লাহ্‌র অধিকার আর অপরটি হল বান্দার অধিকার। আপনি যদি এই দুটি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন তাহলে আপনি আপনার সন্তানসন্ততিকে অবশ্যই সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। আর আপনি খোদ্দামদের জন্য তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও কাজ করবেন, যারা আপনাদের গাইড মনে করে। তাদেরকেও সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করতে সক্ষম হবেন। অন্যদের দিকনির্দেশনা বা সঠিক পথপ্রদর্শন করার সফল উপায় হল নিজের আচারআচরণের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখা। এছাড়া স্মরণ রাখবেন যে, কোন জামা'তের সাফল্য বা জীবন কোন এক প্রজন্মের ওপর নির্ভর করে না। বরং সে-সকল জাতি উন্নতি করে যারা নিজেদের মাঝে বিশেষ ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। আর এটা কেবল তারাই আনে যারা প্রজন্মপরম্পরায় পরস্পরের তরবিয়ত করে এবং সকল প্রকার উন্নতির ও সাফল্যের জন্য কুরবানী করে। আর এমন জাতির উন্নতি কখনও থেমে থাকে না। এছাড়া এমন মানুষ যারা যুগ-ইমামকে মসীহ মাওউদ হিসেবে মেনেছে এবং গ্রহণ করেছে তারা দাবী করে যে, আমরা রসূল (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষা সারা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব। এই দাবী তখনই সত্য প্রমাণিত হবে যখন সব আহমদী কুরআনের শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমে এবং রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী মান্য করার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে নিজেদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক মান উন্নত করার চেষ্টা করবে। তাই আমাদের কোনভাবে বসে থাকার সুযোগ নেই। যেভাবে প্রত্যেক দিন সকালে সূর্য উদিত হয় ঠিক সেভাবে আমাদের প্রতিটি দিন যেন জামা'তের প্রতিটি সদস্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির সংবাদ নিয়ে সূর্য উদিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আশ্বস্ত হতে পারি না। আপনাদের ব্যানারে আপনারা গর্বের সাথে একটি স্লোগান লিখেন। যেখানে মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন, যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে মানব জাতির সংশোধন হতে পারে না। এটি শুধু বুলিসর্বস্ব নয় বা মোটেও এমন নয় যা নিয়ে শুধু আমরা গর্ব করে বসে থাকব বরং এটি খোদ্দামুল আহমদীয়াকে অনুপ্রাণিত করা উচিত বা জাগ্রত করা উচিত। এই স্লোগান আপনাদের খোদ্দামের অনুষ্ঠানে পরিষ্কারভাবে ফলাও করে প্রচার করা হয় যেন এটি প্রত্যেক খাদেমের হৃদয়ে বা অন্তকরণে প্রোথিত হয়ে যায়। সত্যিকার অর্থে প্রত্যেক খাদেম কোন পদে থাকুক বা না থাকুক, এই শব্দগুলোকে নিজেদের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়া উচিত যে, আমি এগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত কি-না। তাদেরকে তাদের নিজেদের সংশোধন করে জাতির সংশোধনের জন্য ভূমিকা রাখা উচিত। জাতীয় সম্পদে পরিণত হতে চাইলে আপনাদেরকে সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানে উপনীত হতে হবে নতুবা শুধু এ শব্দগুলো বুলি হিসেবে আওড়ানো অর্থহীন। আমি স্মরণ করাতে চাই, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সকল পর্যায়ের আমেলার সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে যদি নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করে তাহলে মজলিসের ওপর এর অসাধারণ প্রভাব পড়বে। বিশেষ কোন অনুষ্ঠান যদি আপনারা নাও করেন তবুও ব্যক্তিগত আদর্শের মাধ্যমে আপনারা অন্যদের জন্য হেদায়াতের কারণ হবেন। অন্য খোদ্দামরা দেখবে যে, আপনারা নিষ্ঠাবান। তখন তারা আপনাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করবে। আমি অল্পবয়স্ক ছোট খোদ্দামদের বলতে চাই আপনাদের এটি মনে করা উচিত নয় যে ,আপনাদের বয়স কম, তাই ধর্মের বিষয়ে বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আর এ কথাও মনে করা উচিত নয় যে, আপনাদের এই বয়সে শুধু খেলাধুলায় মত্ত থাকলেই চলবে। আপনাদের অবশ্যই গঠনমূলক বিনোদনের অধিকার রয়েছে। অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু একইসাথে আপনাদের মনে রাখতে হবে, আপনারা সাবালক বয়সে পদার্পণ করতে যাচ্ছেন। সত্যিকার অর্থে অতীতকালে মানুষ শৈশবেই বিয়ে করত আর তাদের ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পিত হত। এছাড়া ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে কম বয়স্ক যুবক তথা ১৮-১৯ বছর বয়সের যুবকরা সে সময়কার বড় বড় যুদ্ধে কেবল অংশগ্রহণই করে নি বরং তাদেরকে কমান্ডার পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা অসাধারণ সাহস নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছে। অসাধারণ ঈমান তারা প্রদর্শন করেছে। তাই আপনাদের যোগ্যতাকে খাটো করে দেখবেন না। ধর্মের বিষয়টি পরে দেখা যাবে– একথাও মনে করবেন না বরং যা করার তা এখনই করতে হবে। কিশোর হিসেবে এবং যৌবনের প্রারম্ভে আপনাদের নিজেদের যে গুরুত্ব আছে তা বুঝতে হবে। এরপর পাশাপাশি আহাদনামায়

আপনারা পড়েন যে, আপনাদের বিশ্বাস, দেশ ও জাতির জন্য আপনারা সকল কুরবানীর জন্য প্রস্তুত। আপনারা শুধু মৌখিকভাবে উচ্চস্বরে শব্দগুলো আওড়াবেন না বরং আপনাদের কর্ম যেন এর সত্যায়ন করে। আপনারা যদি সত্যিকার অর্থে অঙ্গিকার করে থাকেন তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা দায়িত্ব হল নামায পড়া। ভাল খাদেম হওয়ার সবচেয়ে উত্তম মন্ত্র এটিই। দৈনিক পাঁচ বেলার নামায আপনাদের পড়া উচিত। আর সঠিক মনোযোগ না দিয়ে খুব তাড়াহুড়া করে নামায পড়বেন না। মনোযোগ সহকারে নামায পড়া উচিত। নামাযে সঠিক মনোনিবেশ করা উচিত। আল্লাহ্‌র সত্যিকার ভালবাসা যেন আপনাদের হৃদয়ে গ্রথিত এবং প্রোথিত থাকে। এ সময়টা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য কাজে লাগান। শুধু পরিবারের জন্য নামায পড়বেন না। শুধু নিজের জন্য পরিবারের জন্য নামাযে দোয়া করবেন না বরং জামা'ত এবং জাতির জন্য দোয়া করুন। একইভাবে সকল খোদ্দাম এবং আতফালদের প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত তা কয়েক রুকুই হোক না কেন বা কয়েক আয়াতই হোক না কেন। আপনাদের কুরআনের অর্থ বুঝার চেষ্টা করতে হবে যেন সর্বোত্তম নৈতিক শিক্ষা কি তা আপনারা রপ্ত করতে পারেন এবং আল্লাহ্ কি চান, তা যেন আপনারা বুঝতে পারেন। একটি পন্থা যা আপনারা অবলম্বন করতে পারেন তা হল কুরআনের যে কোন একটা নির্দেশকে বেছে নিন আর দৃঢ়ভাবে সংকল্প করুন যে, 'আমি এটি মেনে চলব' আর সেটিকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করুন। যেকোন মূল্যে আমি এটি মেনে চলব। আর এরকম দৃঢ় সংকল্প করুন যেন তা আপনার জীবনের স্থায়ী অংশ হয়ে যায়। যদি আপনাদের প্রত্যেকেই একটা দৃঢ় সংকল্প করে, একটা ক্ষতিকর জিনিস এড়ানোর চেষ্টা করে এবং একইভাবে একটি ভাল গুণ রপ্ত করার চেষ্টা করে যা কুরআন শিখিয়েছে, তাহলে বছর শেষে আপনি অনেক পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবেন আর অনেক পুণ্য পাপের জায়গা দখল করে নিবে। যতই পুণ্যের পথ অনুসরণ করবেন, তাকওয়ার পথ অনুসরণ করবেন ততই পাপ দূর হতে থাকবে। আরেকটি মহান গুণ যার বিষয়ে আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি তা হল সত্য বলা। সত্য বলা সম্পর্কে আমি গুরুত্বারোপ করে থাকি। আজকে ইজতেমা থেকে যখন ফিরে যাবেন আপনারা এই দৃঢ় এবং আন্তরিক সংকল্প নিয়ে যাবেন যে, আপনারা সবাই সদা সত্য বলবেন। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, সদা সৎ পন্থা অবলম্বন করবেন। মিথ্যার বিন্দুমাত্র সংশ্রবণ যেন আপনার কথায় মিশ্রিত না থাকে। সকল স্থানে সকল সময়ে সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখা উচিত। সত্য থেকে কখনও বিচ্যুত হবেন না। খোদ্দামুল আহমদীয়ার তরবীয়ত বিভাগ নিশ্চিত করবেন, খোদ্দামরা যেন দৈনিক পাঁচ বেলা নামায পড়ে, কুরআন পাঠ করে এবং মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক পাঠ করে। একই সাথে তাদের এটিও নিশ্চিত করা উচিত, আমাদের খোদ্দামরা যেন সর্বদা সত্য বলে এবং সত্যের ভিত্তিতে কাজ করে। সব খোদ্দামের সত্য বলার গুরুত্ব বুঝা উচিত। খোদ্দামদের এই চেষ্টা খোদার নৈকট্যলাভের কারণ হবে। খোদ্দামকে এটি বুঝতে হবে যে, মিথ্যা বলা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করার নামান্তর। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, সকল প্রকার প্রতিমাপূজা এবং মিথ্যা থেকে এড়িয়ে চলা উচিত কেননা মিথ্যা একধরনের মূর্তি। আর যে ব্যক্তি মিথ্যার ওপর নির্ভর করে সে আল্লাহ্‌তে আস্থা বিসর্জন দেয়। মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে। মিথ্যা হল শিরক যা যেকোন মূল্যে আপনাকে প্রতিহত করতে হবে। আপনাদের মাঝে যারা জেনেশুনে মিথ্যা বলে বা প্রতারিত করে, তারা প্রতিমাপূজারীদের থেকে ভিন্ন কিছু নয়। তারা একই ধরনের পাপ করে। মিথ্যাকে তারা খোদার জায়গায় বসায়। তারা মিথ্যা বলে লাভবান হবে বলে মনে করে। তাদের ধারণা হল, সত্য বললে তারা শাস্তি পাবে। এটি স্মরণ রাখবেন, আপনি যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সদা সত্য বলেন আর আল্লাহ্‌র শিক্ষা মেনে চলার খাতিরে সত্য বলেন তাহলে নিশ্চিত থাকতে পারেন, আপনার চূড়ান্ত ক্ষতি হবে না। আরেকটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা আপনার মাঝে সৃষ্টি করা উচিত তা হল, অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা, ভালবাসা প্রদর্শন করা। অন্যের দুঃখকষ্ট দূর করার চেষ্টা করা। পারস্পরিক ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা। জাতিকে যদি সুদৃঢ় হতে হয় তাহলে জাতির মাঝে ঐক্য এবং একতা থাকা আবশ্যক এবং অন্যের বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যের দুঃখকষ্ট ভাগাভাগি করা উচিত। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, অনেক সময় অনেক তুচ্ছ বিষয় বা গুরুত্বহীন বিষয় অনেক ভয়ানক রূপ ধারণ করে। যাদের ভাই-ভাই হওয়া উচিত তাদের মাঝে ভয়াবহ বিবাদ দেখা দেয়। আমাদের জামা'তে যদি এমন একজনও থাকে তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য পুরো জামা'ত বদনামের কারণ হয় আর আমাদের দাবী, **ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারও 'পরে**– এটি অর্থহীন প্রমাণিত হয়। তাই আমাদের নিজেদের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা এবং ভালবাসার পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত। ক্রোধ প্রদর্শন করার মাঝে কোন মঙ্গল কিছু নেই বা এটি কোন ধরনের সাহসিকতার বিষয় নয়। সাহসের বিষয় হল নিজের রাগ এবং ক্রোধকে

দমন করা। এক হাদীসে মহনাবী (সা.) বলেছেন, যারা একে অন্যকে খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে ভালবাসে, কিয়ামত দিবসে এমন ব্যক্তিদের আল্লাহ্ তা'লা দয়ার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তাই কিয়ামত দিবসে যদি আল্লাহ্ তা'লার করুণার ছায়াতে আশ্রিত হতে চান তাহলে পরস্পরকে ভালবাসতে হবে। আমাদের সকল তুচ্ছ হিংসা এবং ঘৃণা পরিত্যাগ করা উচিত। পরস্পরকে ক্ষমা করা উচিত। এভাবে আমরা পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে পারি এবং সাম্যের ভিতকে দৃঢ় করতে পারি আর আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করতে পারি। অতএব এগুলোকে সামান্য বিষয় হিসেবে নিবেন না বরং এসব গুণাবলী অবলম্বনের চেষ্টা করুন। আমি পূর্বেও বলেছি, খোদ্দামদের সংশোধন কোন ব্যক্তিগত বিষয় নয়, ব্যক্তিগতভাবে সংশোধন করা উদ্দেশ্য নয় বরং তা সমগ্র জামা'তের সংশোধন হিসেবে পর্যবসিত হয়। সকল ক্ষেত্রে আপনাদেরকে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করুন এবং সকল পাপ এতটা এড়িয়ে চলুন যেন ইবাদত আপনাদের জীবনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। আর সকল অনৈতিক কাজের প্রতি যেন আপনাদের ঘৃণা সৃষ্টি হয়। জগতের পেছনে দৌড়ানো যেন আপনাদের উদ্দেশ্য না হয় বরং খোদার অধিকার প্রদান করা আপনাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আপনাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করা। খোদার ইবাদতের পাশাপাশি ছাত্রদের তাদের পড়াশুনার বিষয়ে মনোযোগ দেয়া উচিত। সব এমন ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে খুব পরিশ্রম করা উচিত। আর পড়ালেখায় সর্বোত্তম ফলাফল লাভের চেষ্টা করা উচিত। আপনারা যখন সাবালক হবেন তখন আপনারা যেন আপনাদের পেশায় সর্বোচ্চ বা সর্বোত্তম মানে পৌছতে পারেন। সত্যিকার অর্থে আহমদী যুবকদের সব ভাল ভাল পেশায় যাওয়া উচিত। সেটি সরকারী চাকরী হোক, সিভিল সার্ভিস হোক বা অন্য কোন ক্ষেত্র। আমাদের খোদ্দামদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছতে হবে। এটি বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন তাই এর জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের খোদ্দামদের মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পরই অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করা উচিত নয় বরং তাদের সর্বোত্তম পড়ালেখা করা উচিত। আমাদের জামা'তে দেখা যাচ্ছে মেয়েরা তুলনামূলকভাবে ছেলেদের চেয়ে পড়ালেখায় ভাল করছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি খোদ্দামদের চ্যালেঞ্জ দিব, আপনারা এই ভারসাম্যহীনতা দূর করার চেষ্টা করুন এবং পড়ালেখায় সর্বোত্তম ফলাফল করার চেষ্টা করুন। যদি আপনারা সফল হন তাহলে এটি থেকে শুধু আপনারা লাভবান হবেন না বরং বৃহত্তর সমাজ লাভবান হবে আর আমাদের জামা'তের জন্য এটি গর্বের কারণ হবে এবং জামা'তের সম্মান এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আপনাদের এই সাফল্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একাডেমিক সাফল্যকে নিশ্চিত করবে, তারা আপনাদের দৃষ্টান্ত দেখে শিখবে। এভাবে পড়ালেখার উন্নতির একটা স্থায়ী চক্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সৃষ্টি হবে। জ্ঞানের সকল শাখার পরম মার্গে আপনারা পৌছবেন, ইনশাআল্লাহ্ কেননা মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে খোদা তা'লা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তাঁর (আ.) মান্যকারীরা জ্ঞানের সকল শাখায় চরম মার্গে উপনীত হবে। তাই আপনারা সেই লোক হোন যাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়। তাহলে আপনারা ঐশী কল্যাণ এবং বরকতের ভাগী হবেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে সত্যিকার অর্থে নিজেদের অসাধারণ দায়িত্বকে বুঝার তৌফিক দান করুন এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য হিসেবে যে দায়িত্ব বর্তায় সেগুলো পালন করার তৌফিক দিন। আপনারা খোদার প্রাপ্য প্রদান করুন এবং তার সৃষ্টির প্রাপ্যও প্রদান করুন। আর আপনারা এমন লোক হোন যারা বিশ্বে আমাদের জামা'তের সুনাম প্রতিষ্ঠা করবে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে সফল করার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আপনাদের সাফল্য লাভের জন্য আমার আন্তরিক দোয়া থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়াকে সকল অর্থে আশিসমণ্ডিত করুন, বরকতমণ্ডিত করুন। আমীন

## একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তি

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জানানো যাচ্ছে, করোনা ভাইরাসের কারণে এ বছর (২০২১ ইং) কাদিয়ান জলসায় শুধুমাত্র ভারতে বসবাসকারী সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভারত ছাড়া বহির্বিশ্বের অন্য কোন দেশের সদস্যকে এ বছর কাদিয়ান জলসায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে না। তবে বিদেশে বসবাসরত ভারতীয় নাগরিক ইচ্ছে করলে এ বছর কাদিয়ান জলসায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

বিনীত

**ওয়াকিলে তা'মীল ও তানফীয**

(ভারত-নেপাল-ভুটান)

পর্ব-২১

# প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর

গত ২১ আগস্ট ২০২১ সালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্কের সদস্যরা ভার্চুয়াল মোলাকাতে হুযূর (আই.)-এর কল্যাণময় সান্নিধ্য লাভ করেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর (আই.) কে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিল। আমরা আজকের পর্বে এই মোলাকাতের বিশেষ বিশেষ প্রশ্নোত্তর পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

***প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম প্রিয় হুযূর, আমার প্রশ্ন হল, করোনা মহামারির কারণে অনেক জামা'তী প্রোগ্রাম করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু দুই বছর পর এবছর জলসা সালানা যুক্তরাজ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে, এই দুই বছর পর জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হওয়ায় আপনার অনুভূতি কি?***

**প্রিয় হুযূর (আই.):** খুবই ভাল লেগেছে, এবছর জলসা সালানা হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। আলহামদুলিল্লাহ্ পড়েছি এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি। কেননা তিনি আমাদের সীমিত পরিসরে হলেও জলসা সালানা করার তৌফিক দিয়েছেন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জামা'তে MTA'র মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় একত্র হয়ে এবং নিজের ঘরে বসেও মানুষ জলসা দেখেছে। অনেক মানুষ আমাকে লিখেছে যে, তারা নিজেদের ঘরে বসে একত্র হয়ে জলসা দেখেছে এবং জলসা সালানার মত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। অনেকেই লঙ্গর খানার মত আলু-গোশ্‌ত এবং ডাল তৈরি করেছেন। অনেক জায়গায় জামা'তী ভাবেও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এভাবে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী লাখ লাখ মানুষ জলসা দেখেছে। যারা জামা'তী ব্যবস্থাপনায় সমবেত হয়ে জলসা দেখেছে তাদের সংখ্যাও লাখের অধিক। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা করোনার পর এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। আর ভবিষ্যতের জন্য নতুন দ্বারও উন্মুক্ত হয়ে গেছে। মানুষ ভাবছিল জলসা কীভাবে হবে? কবে হবে?। আর জামাতের ওপর হতাশা আর কষ্টের যে ছায়া পড়েছিল সেই ছায়া দূর হয়ে গেছে। যখন জামাতের সদস্যদের মধ্যে থেকে এই দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়, তখন আমি স্বাভাবিকভাবেই আনন্দিত হয়েছিলাম। আমার মনে হয় তোমরাও আনন্দিত হয়েছিলে। কি তোমরা খুশি হয়েছিলে না?

***প্রশ্নকারী:*** জ্বী হুযূর অবশ্যই খুশি হয়েছিলাম। জাযাকাল্লাহ্ হুযূর।

***প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হল, আফগানিস্তানের যুদ্ধের পর পৃথিবীর ওপর কী প্রভাব পড়বে?***

**প্রিয় হুযূর (আই.):** আফগানিস্তানে গত ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে যুদ্ধ হচ্ছে। এখানের অবস্থাই এরকম। অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হতেই থাকে। আফগানিস্তানের এই অবস্থা তখন থেকে চলমান, যখন মসীহ্ মাওউদ (আ.) সাহেবযাদা আবদুল লতিফের (রা.) শাহাদাতের পর বলেছিলেন যে, হে কাবুলের মাটি তুমি কখনও শান্তিতে থাকবে না। অতএব, তখন থেকেই এই মাটির শান্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই অস্থিতিশীল অবস্থা এখনও চলমান। আর এখন তালেবানরা শাসনে এসেছে। দেখা যাক তারা কীভাবে শাসন পরিচালনা করে। আর কতদিন অন্যান্য জাতির সরকার তাদের সাথে কাজ করতে পারে! আজকাল, যেকোন সরকার যতদিন বৈশ্বিক সরকার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তারা ঠিকভাবে শাসনকাজ পরিচালনা করতে পারে না। পৃথিবীর সকল দেশ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল। তাদের মাঝে আন্তঃব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। এই জিনিসগুলো তালেবানকেও ভাবতে হবে। তারা যদি ঠিকভাবে সরকার পরিচালনা করে, তাহলে তারা পৃথিবীর সাথে কিছুদিন চলতে পারবে। কিন্তু তাদের উগ্রবাদী চিন্তা চেতনার কারণে মনে হচ্ছে কিছু দিন পর সেখানে পুনরায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তাদের মাঝ থেকেই কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে যাবে। এমনকি এখনই ক্ষমতা পাবার পরই যেভাবে তালেবানরা আফগানিস্তানের পতাকা ভূপাতিত করে তালেবানের পতাকা উড্ডয়ন করেছে; তারা তো দেশ বিজয় করে নি, তাদের আফগানিস্তানের পতাকা উড্ডয়ন করাই উচিত ছিল। অনেকেই এই হীন কর্মের প্রতিবাদ করেছে আর মিছিলও করেছে। তারা আফগানিস্তানের পতাকাও পুনঃউড্ডয়ন করেছে। যার ফলে যতটা খবরে এসেছে তালেবানরা তাদের ওপর গুলি চালিয়েছে এবং কিছু লোক মারাও গেছে। অতএব, এখনও সেখানে ব্যাপক অস্থিতিশীল অবস্থা চলমান। প্রশ্ন হল,

পৃথিবীর ওপর এর কি প্রভাব পড়বে? এই কারণে প্রথমত দেশে অস্থিতিশীল অবস্থা আরও বেড়ে যাবে, যদি তালেবানরা তাদের কট্টরনীতি পরিবর্তন না করে, শান্তি এবং সহনশীলতার নীতি অবলম্বন না করে। অন্যদিকে যদি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ মনে করে যে, তালেবানরা পৃথিবীর জন্য হুমকিস্বরূপ তাহলে অন্য কোন না কোন রাষ্ট্র সেখানে হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করবে। সর্বপ্রথম রাশিয়া ছিল, যখন তারা ছেড়ে দিল তখন আমেরিকা দখল করেছিল, এখন আমেরিকা ছেড়ে দিয়েছে, এখন হয়ত চীন তাদের ক্ষমতা প্রমাণের জন্য সেখানে হস্তক্ষেপ করবে। একইভাবে অন্যান্য রাষ্ট্র আসবে তারাও হস্তক্ষেপ করবে। এই পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক রাজনীতিতে অবশ্যই কিছু পরিবর্তন আসবে। এই এলাকার গুরুত্বের কারণে অন্যান্য দেশ আফগানিস্তানকে দখল করতে চাইবে কিন্তু এসব কিছু তালেবানের রাষ্ট্রনীতির ওপর নির্ভর করছে। এখন দেখা যাক সামনে আর কী হয়। তখন বুঝা যাবে। দু-চার মাসেই সকল অবস্থা বুঝা যাবে।

***প্রশ্ন: কোন কোন বিজ্ঞানী বলে থাকেন যে, করোনার কারণে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। আমার প্রশ্ন হল, হুযূর এই বিষয়ে আপনি কি মনে করেন আর করোনার কারণে আপনার জীবনে কী পরিবর্তন এসেছে?***

**প্রিয় হুযূর (আই.):** আমার জীবনে কোন পরিবর্তন আসে নি। বিজ্ঞানীরা একথা তাদের জন্য বলেছেন, যারা জাগতিক চিন্তাচেতনায় মগ্ন এবং যারা নাইট ক্লাবে না গিয়ে থাকতে পারে না বা যারা একত্র হয়ে মদ পান না করে থাকতে পারে না। যারা হৈ-হুল্লোড় আর নাচ গান না করে বাঁচতে পারে না। যখন এসব কাজে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে তখন তারা সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে। যখন কোন রোগ মহামারি আকার ধারণ করে আর সারা পৃথিবীতে এভাবে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর একটি বিরূপ প্রভাব পড়ে যে, আমরা বাঁচব কি বাঁচব না। কিন্তু যদি মানুষ এটি জানে যে, জীবন-মৃত্যু আল্লাহ্ তা'লার হাতে। আর যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত প্রতিরোধব্যবস্থা তারা পালন করে আর চিকিৎসাব্যবস্থার মাধ্যমে উপকৃত হয়, তাহলে জাগতিক কিছু জিনিস না পেলে, কিছু কাজ না করতে পারলে বা দৈনন্দিন রুটিন পরিবর্তন হওয়ার কারণে; হ্যা এগুলো স্বাভাবিকভাবে সামান্য হলেও অস্থিরতা বাড়ায়। কিন্তু এসব কারণে কারও খুব বেশি দুশ্চিন্তা বা অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত যেন তিনি এই অবস্থা দ্রুত ঠিক করে দেন এবং পৃথিবীর মানুষ যেন আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, কেউ যদি মহামারির কারণে হতাশায় ভুগে তাহলে তাও দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয় (১৩ঃ২৯)। তাই এই অবস্থায় বেশি বেশি আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত হওয়া উচিত। কিন্তু জাগতিক মানুষ আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। তাই তাদের ওপর বেশি বিরূপ প্রভাব পড়ে। আর এই দিনগুলোতে আমার রুটিনে পরিবর্তন বলতে, আমার সাথে সশরীরে সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া আমার রুটিনে কোন ধরনের পরিবর্তন হয় নি। আমার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজই কাজ থাকে। এত কাজ যে, আমার মনেই হত না বাহিরে মহামারি আছে কি না। আর যতটা মোলাকাতের কমতি ছিল, সেটা এভাবে তোমাদের সাথে ভার্চুয়াল মোলাকাত করে আমি পূরণ করে নেই। কমপক্ষে সপ্তাহে দুদিন এইভাবে কেটে যায়। এছাড়া আরও ব্যস্ততা থাকে, অফিসিয়াল মোলাকাত থাকে। এছাড়া পত্র বিনিময়, উত্তর দেয়ার কাজ থাকে। এই সকল কাজ আল্লাহ্‌র কৃপায় চলতে থাকে। আহমদীয়া জামা'ত এখন অনেক দেশে বিস্তৃত। তাদের সবার কাজ দেখা, নির্দেশনা দেয়ায় সময় কীভাবে চলে যায় তা বুঝাই যায় না। বরং সময় বেশ কম মনে হয় আর কাজ অনেক বেশি মনে হয়।

***প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হল, আপনার সকল কাজ সামলানো কি আপনার কাছে খুব কঠিন মনে হয়?***

**প্রিয় হুযূর (আই.):** যদি সকল কাজ সঠিক সূচারুরূপে করতে হয়, তাহলে কাজ কঠিন হবেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সকল কাজ সহজ করে দেন। আর সব কাজ সহজভাবেই হয়ে যায়। আমি দিনের কাজ দিনেই শেষ করি কিন্তু তবুও চিন্তা থাকে যে, সঠিকভাবে কাজ করতে পারছি তো। অন্যথায় আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ভাগীদার হতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কঠিন কাজ। তুমি যদি সব কাজ সূচারুরূপে করতে চাও, তাহলে কাজ অবশ্যই কঠিন লাগবে আর এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে।

***প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হল, আজকাল করোনা মহামারির কারণে অনেক ঘরেই বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা হচ্ছে। এসব সমস্যার সমাধান কি?***

**প্রিয় হুযূর (আই.):** ঘরে কী সমস্যা হচ্ছে? পারস্পরিক ঝগড়াবিবাদ। প্রকৃত পক্ষে এই করোনা মহামারিতে আমাদের আল্লাহ্‌র প্রতি আরও বিনত হওয়া উচিত। যদি এই মহামারি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের পারস্পরিক সম্মান, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, তওবা করা উচিত এবং পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত, যাতে আল্লাহ্ তা'লা এই শাস্তি, মহামারিকে দূর করে দেয়। আর যদি এটি আমাদের জন্য কোন পরীক্ষা হয়, সেক্ষেত্রেও আমাদের আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা উচিত, যাতে আমরা এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারি এবং আমাদের মাঝে যেন পারস্পরিক ভালবাসা তৈরি হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পারস্পরিক খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ

(আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতি অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। কখনও কখনও আল্লাহ্ তা'লা নিজের অধিকার মাফ করে দেন। কিন্তু মানুষের অধিকার আদায় না করলে তিনি ক্ষমা করেন না। যদি স্বামী তার স্ত্রীর অধিকার আদায় না করে এবং বিনা কারণে ঝগড়া করে। সম্প্রতি আমি জলসায় নারীদের উদ্দেশ্যে এত বড় বক্তৃতা দিয়েছি। এমন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে গুণাহগার (পাপী)। আবার যদি স্ত্রী স্বামীর অধিকার আদায় না করে। আর বিনা কারণে ঝগড়া করার চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে সেও অধিকার আদায় করছে না। আবার যদি ভাই বোন ঝগড়া করে, তাহলে তারাও পারস্পরিক অধিকার আদায় করছে না। আবার যদি বাবা সন্তানদের সাথে সদাচরণ না করে, তাহলে সেও তাদের অধিকার আদায় করছে না। একইভাবে যদি মা বিরক্ত হয়ে যায় এবং সন্তানদের কষ্ট দেয়– এরকম পরিস্থিতিতে সবাইকে একতাবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া উচিত। এভাবে তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাও লাভ করবে। হ্যাঁ পরিস্থিতির কারণে কেউ বাহিরে যেতে পারছে না, কোন কাজ করতে পারছে না। কিন্তু পরিস্থিতি খুব কঠিনও না। কেউই শতভাগ নিয়ম মেনে চলে না। করোনার কারণে কাজেকর্মে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা বিনা দ্বিধায় বাজারে চলে যাচ্ছ। রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছ, পার্কে ঘুরতে যাচ্ছ। কোন কোন বাবা ইচ্ছা করলে বন্ধুদের সাথে গল্প করতে চলে যায়। আবার মায়ের মন চাইলে বন্ধুদের সাথে গল্প করতে চলে যায়। যখন তোমাদের মন চায় তখন তোমরাও চলে যাও। অতএব, তোমরা এতটাও কঠোর বিধি-নিষেধ মেনে চলছ না। যদি তোমরা শতভাগ বিধি-নিষেধ মেনে চলতে তাহলে মহামারি আগেই শেষ হয়ে যেত। হ্যাঁ! বিধি-নিষেধের কারণে কখনও কখনও মানসিক সমস্যা হয়ে যায়। কিন্তু এর সমাধান হল আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা। যাতে তিনি এই বিধি-নিষেধ দূর করে দেন এবং এই মহামারি যেন দূর হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ যেন আমাদের ওপর কৃপা করেন। তাই এই অবস্থায় দোয়ার ওপর জোর দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এটা অনুধাবন করা জরুরী যে, আমরা কীভাবে পারস্পরিক অধিকার আদায় করতে পারি। যদি এগুলো করতে পার তাহলে ঘরে শান্তি এবং প্রশান্তি বিরাজ করবে। এই অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায়ও থাকে। করোনা শুধুমাত্র একটি বাহানা হয়ে গেছে। আগে বাবা সারাদিন ঘরের বাহিরে থাকত তাই বুঝা যেত না যে, তার প্রকৃতি কেমন। কিন্তু এখন যেহেতু সে ঘরে থাকে বেশিরভাগ সময় তাই স্ত্রী সন্তানদের তার কঠোরতা সহ্য করতে হয়। এ কারণে তারা বলে বাবা এমন করেছে অথবা মা বিরক্ত হচ্ছে। আগে তোমরা বেশি বাহিরে ঘুরতে। কিন্তু এখন তোমরা কম সময় বাহিরে থাক। আর আমি জানি এখনও তোমরা ঘুরে থাক। তাই না? আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর যাতে এই মহামারি শেষ হয়ে যায়।

**প্রিয় হুযূর (আই.):** আপনাদের অনুষ্ঠান খোলা জায়গায় হচ্ছে। দুই বছর পর এই ইজতেমা হচ্ছে?

**প্রশ্নকারী:** জ্বী হুযূর, শেষবার ২০১৯-এ হয়েছিল।

**প্রিয় হুযূর (আই.):** ইজতেমা তখনই লাভজনক হবে; যেভাবে আমি আগে বলেছি যখন আপনারা নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অনুধাবন করবেন। মানুষ যদি তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য না জানে তাহলে কোন লাভ নেই। আল্লাহ্ তা'লা জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, আমি মানুষকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। একজন আহমদীর জানা থাকা উচিত যে, এটাই তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। তাকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। বাকি এই ইজতেমা, তরবিয়তি অনুষ্ঠান, জলসা বেশ কিছুদিন পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সকল বিষয় মানুষের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতির জন্য। আর জ্ঞান অর্জনের পর যদি নিজের জীবনে বাস্তবায়ন না করে তাহলে এসকল বিষয়ের কোন লাভ নেই। অতএব, এই লক্ষ্য পূরণে চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা এখানে উপস্থিত সবাইকে তৌফিক দিন, যাতে সবাই এখানে শেখা বিষয়ের ওপর আমল করতে পারে, আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, তাকওয়ার মান উন্নত করতে পারে, এবং নামাযের প্রতি মনোযোগী হতে পারে। এগুলোই একজন আহমদীর পরিচয় এবং এরকম হওয়া উচিত। সবার চরিত্র যেন উত্তম হয় যাতে অন্যরা দেখে বলতে পারে যে, এরা উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং এরা সত্য ধর্মের শিক্ষা উপস্থাপন করে। সম্প্রতি জার্মানিতে বন্যা হয়েছে। যেখানে খোদ্দামুল আহমদীয়া অনেক সেবা করেছে। মানুষ আপনাদের সেবার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। আল্লাহ্ তা'লা সেসকল খোদ্দামকে উত্তম প্রতিদান দিন যারা এই মহান সেবা করেছে। মানুষের ওপর এই কাজের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আর এই ইতিবাচক প্রভাব কেবলমাত্র জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই যেন না হয়। বরং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও ইতিবাচক প্রভাব পড়া উচিত। এখন এই এলাকায় আরও বেশি যাওয়া-আসা করুন। সেখানে মানুষের সেবা আপনারা ইতোমধ্যে করেছেন। এখন সেখানে প্রেম, ভালবাসা আর শান্তির শিক্ষা বেশি বেশি প্রচার করুন। যাতে এই এলাকায় আপনাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। এই এলাকার মানুষের হৃদয় এখন আপনাদের জন্য নরম রয়েছে। এখন তাদের এই কোমল হৃদয়ের দ্বারা আপনারা লাভবান হওয়ার চেষ্টা করুন। আর এটাই একজন প্রকৃত মুমিনের পরিচয় যে, সে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবার এই কাজ করার তৌফিক দিন।... *(চলবে)*

*ভাষান্তর: মাওলানা মসীহ্ উর রহমান*

লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইজতেমায়

# হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.)-এর সমাপনী বক্তৃতা

তাং: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং

দু'বছর পর যুক্তরাজ্য লাজনা ইমাইল্লাহ্ পুনরায় তাদের ন্যাশনাল ইজতেমা করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। সব আহমদী জানে যে, আমাদের জলসা এবং ইজতেমার প্রধান উদ্দেশ্য হল জামা'তের সদস্যদের বা অংশগ্রহণকারীদের আধ্যাত্মিক মান এবং নৈতিক মানকে উন্নত করা। আর তাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং ঈমানে সমৃদ্ধ হওয়া। এই হল ইজতেমার মূল উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যগুলো যদি সামনে না থাকে তাহলে ইজতেমা বা এ ধরনের অনুষ্ঠান করা অর্থহীন বা উদ্দেশ্যবিহীন। আজকের বিশ্বে মানুষের জ্ঞান এবং মানুষের বোধ-বুদ্ধি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বের যুগের তুলনায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে দূরত্ব ঘুচে গেছে। আর বিভিন্ন ইলেকট্রনিক এবং ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যমের সুবাদে তা আরও সহজতর হয়েছে, যেমন: টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও এবং ইন্টারনেট ইত্যাদি। এগুলোর ফলে এক এলাকার সাথে আরেক এলাকার দুরত্ব নেই বললেই চলে। এই প্রযুক্তিগত বিপ্লব যা সাধিত হয়েছে, ৫০ বছর পূর্বেও এমনটি ভাবাও যেত না। সত্যিকার অর্থে যোগাযোগ মাধ্যমের এই যে অসাধারণ বিপ্লব সাধিত হয়েছে, স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে বা অন্যান্য স্মার্ট টেকনোলোজির যে উন্নতি হয়েছে তা আজ ১০ থেকে ১৫ বছর পূর্বেও ভাবা যেত না। সারাবিশ্ব এমনভাবে আন্তঃদেশীয় সম্পর্কে যুক্ত হয়ে পড়েছে যা মানব ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নি। যেমন এখন মানুষ একে অপরকে দেখতেও পায় পাশাপাশি কথাও বলতে পারে। হাজার হাজার মাইল দূরে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে এক নিমিষে এই যোগাযোগ সম্ভব। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে মানুষ তাদের বিশ্বাসকেও প্রচার করতে পারে, মূল্যবোধকে এবং নিজেদের সংস্কৃতিকেও পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারে। উন্নত বিশ্বে বসবাসকারীরা তাদের জীবনপদ্ধতি হাজার হাজার মাইল দূরে বসবাসকারী গ্রাম বা শহরে বসবাসকারীদের লোকদের সামনে তুলে ধরতে পারে। আর পাশ্চাত্যের দেশগুলো তাদের সভ্যতা এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতি পৃথিবীর দরিদ্র ও অনুন্নত দেশগুলোর সামনে উপস্থাপনের সুযোগ পাচ্ছে এবং পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র এবং অনুন্নত দেশগুলো জানতে পারছে যে, সম্পদশালী দেশগুলো কীভাবে জীবনযাপন করে। অন্যদিকে যারা পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র অঞ্চলে বসবাস করে তথা অনুন্নত দেশে বসবাস করে, তারা উন্নত দেশগুলোর অসাধারণ উন্নতি আর বিলাসিতা দেখতে পায় এবং বাচ্চাদেরও এটি চোখে পড়ে। অবশ্যই এর ফলে তাদের হৃদয়ে এক ধরনের অস্থিরতার জন্ম হয় এবং তারা দুঃখ পায়। অতএব স্যাটেলাইট প্রযুক্তি বা ইন্টারনেট সারা পৃথিবীকে একটি বিশ্বপল্লীতে রূপান্তরিত করেছে। মানুষ কেবল কল্যাণার্থে এগুলো ব্যবহার করছে– তা বলার উপায় নেই। বর্তমান যুগে মানুষ নিজেদেরকে সবচেয়ে সভ্য বা সবচেয়ে বেশি উন্নত মনে করে অথচ বাস্তব বিষয় হল, পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ

শ্রেণি দারিদ্র্যের সবচেয়ে ন্যূনতম পর্যায় বরং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। অনুন্নত বিশ্বের লোকদের জন্য সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হল, তারা অনবরত উন্নত বিশ্বের অসাধারণ সমৃদ্ধশালী জীবনযাপনকারীদের দেখছে অথচ জীবনের জন্য ন্যূনতম জিনিস যা তাদের প্রয়োজন সেটি জোগাড় করাও তাদের জন্য অসাধারণ কষ্টকর। এভাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মাঝে যে দূরত্ব আছে তা দূরীভূত হওয়ার পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সেই দূরত্ব আরও বেড়ে যাচ্ছে। সেই অনৈক্য এবং অন্যায়কে স্পষ্ঠভাবে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। এর ফলে যারা অশেষ কষ্টের মাঝে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে তাদের মাঝে এক ধরনের আক্ষেপ এবং এক ধরনের অসন্তুষ্টি দানা বাঁধছে। পৃথিবীর সম্পদশালী সরকার স্যাটেলাইট টেলিভিশন দরিদ্র দেশের লোকদের জন্য বিনোদনের কারণ মনে করছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই আধুনিক প্রযুক্তি সম্পদশালী এবং দরিদ্রদের মাঝের পার্থক্যকে আরও স্পষ্ঠভাবে তুলে ধরছে। যে অসাম্য রয়েছে সম্পদশালীরা সেদিকে দায়িত্ববোধের সাথে তাকায় না অথচ তাদের বুঝা উচিত, তাদের ঘরের সামনে এক অসন্তুষ্টি দানা বাঁধছে আর এর পরিণতি ধ্বংসাত্মক হতে পারে। আমরা এমন বিশ্বে বসবাস করছি যেখানে বস্তবাদিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেখানে মানুষের বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও এবং মানুষের চোখ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক অন্ধত্বের মাঝে জীবনযাপন করছে। তারা কত অজ্ঞ হয়ে গেছে তা তারা বুঝে না। কত ভাসাভাসা অবস্থার মাঝে জীবন অতিবাহিত করছে, কত অজ্ঞতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করছে, বস্তুবাদিতা তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে– এটি তারা বুঝতে অক্ষম। আমি নিশ্চিত, এমন একটা সময় আসবে যখন তারা বুঝতে পারবে যে, বস্তুবাদীতায় গা ভাসিয়ে দেয়া, টেলিভিশন, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পিছনে অন্ধভাবে ছুটে চলার ফলে তাদের ভয়াবহ ক্ষতি হচ্ছে। যে সম্পদকে তারা কল্যাণকর মনে করেছে বা উন্নতির কারণ বলে মনে করেছে, একদিন এটি আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক ব্যাধিতে পর্যবসিত হবে। এমনভাবে পর্যবসিত হবে যে, ইতোপূর্বে বিশ্ব তা কখনও দেখে নি। তারা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, সম্পদ তাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে কপর্দকশূন্য করে দিয়েছে, নৈতিকভাবে কপর্দকহীন করে দিয়েছে। আমরা এখনই এগুলোর ছাপ দেখছে পাচ্ছি। মানুষ ক্রমশ দুশ্চিন্তায় এবং বিষণ্নতায় এবং মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় এ ব্যাধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, এ সবকিছুর কারণ, তারা বস্তুবাদীতার জালে আবদ্ধ। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, তারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছে বা এই বিশ্বাস তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। আমরা এমন এক বিশ্বে বসবাস করছি যেখানে কোন ব্যক্তি যতই সম্পদশালী হোক না কেন সে আরও বেশি পেতে চায়। আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে তাদের যা নেই তার জন্য আক্ষেপ করে। পুরুষ মানুষ যেখানে সম্পদের লোভে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে জীবনযাপন করছে সেখানে মহিলাদের অবস্থাও একই। এই বৃথা চাহিদার ফলে মানুষের অনুশোচনা এবং আক্ষেপ ও বিষণ্নতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলোকিত হওয়ার পরিবর্তে মানুষ অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। অনুন্নত বিশ্বে যারা বসবাস করছে তারা টেলিভিশনে যা দেখে বা ইন্টারনেটে যা দেখে এর দ্বারা তারা প্রভাবিত হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহলে চিন্তা করুন এখানকার মানুষ বা উন্নত বিশ্বের মানুষ এর ফলে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বস্তবাদিতার মূল কেন্দ্র এবং লোভলালসার মূল কেন্দ্র হল পাশ্চাত্য। অতীতে আমি আহমদী পিতা-মাতাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, তারা এবং তাদের সন্তানরা টেলিভিশনে কী দেখে সে বিষয়ে তাদের সাবধান হতে হবে আর তারা কতটা সময় টেলিভিশন দেখে কাটায়– সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পৃথিবী এখন অনেক এগিয়ে গেছে। মানুষ টিভিতে শুধু অসঙ্গত জিনিস দেখার ভিতরে এখন সীমাবদ্ধ নেই বরং শিশুদেরও অগণিত বাজে জিনিস দেখার সুযোগ আছে। ইন্টারনেটে অনেক বাজে জিনিস দেখার সুযোগ আছে, ইউটিউবে অনেক বাজে জিনিস দেখার সুযোগ আছে, সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মেও তারা অনেক বাজে জিনিস দেখতে পায়। শিশুরা এসব জিনিস ফোনে বা ল্যাপটপে অথবা টেবলেটে পিতা-মাতার দৃষ্টির আড়ালে বা লুকিয়ে দেখে আর পিতা-মাতা তা জানতেও পারে না। কারণ তাদের পিতা-মাতাও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অনেক কিছু দেখে। যেমন ধরুন, যদি তারা একটি ভিডিও দেখে বা কোন অনলাইন গেইমস খেলে তখন এমন অনেক বিজ্ঞাপন আসে যা ক্ষতিকর। বিভিন্ন জিনিসের বিজ্ঞাপন দেয়ার পাশাপাশি নগ্ন ছবি প্রচার করে যা কোনভাবেই তাদের বয়সের জন্য যথাযথ নয়। এটি সত্যিই একটি ভয়াবহ বিষয়। এমন শিশুরা অযথা বা ক্ষতিকর জিনিস দেখে যা শিশুদের জন্য উপকারী না। এ ধরনের রিপোর্ট আমার কাছে আসে। এ কারণে আমি বারবার ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সাবধান করেছি। আমি বারবার বলে আসছি বরং বছরের পর বছর বলে আসছি যে, যারা ফেইসবুক বা টুইটার ব্যবহার করে বা এধরনের প্লাটফর্মে যারা যায়, তাদের অনেক বেশি সাবধান থাকা উচিত। অনেক এমন গবেষণা সামনে এসেছে যে গবেষণায় শিশুদের ওপর এগুলোর ক্ষতিকর দিকগুলো বা মানুষের ওপর এর ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। তারা গবেষণা করে দেখিয়েছে, সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শিশু ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই প্লাটফর্মগুলো এমনভাবে বানানো হয়েছে যেন শিশুরা এতে আসক্ত

হয়ে যায়। অন্য যে কোন আসক্তির মত এগুলো শিশুদের ভিতর আসক্তি সৃষ্টি করে। অতি সম্প্রতি ওয়াল এস্টেট জার্নাল একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে। তাদের জরিপ অনুযায়ী ইন্সটাগ্রাম এবং ফেইসবুকের কর্মকর্তারা নিজেদের কৌশল গোপন রাখছে কেননা এগুলোর কারণে শিশু-কিশোরদের ভয়াবহ ক্ষতি হয়। জরিপে দেখা যায় যুক্তরাজ্যে শতকরা ১৩ভাগ শিশু-কিশোরের মাঝে এগুলোর কারণে আত্মহত্যার মনমানসিকতা দানা বেঁধেছে। পরিশেষে তারা সোশ্যাল মিডিয়ার এই ক্ষতিকারক দিকগুলো স্বীকার করছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সংশোধনের জন্য নিয়োজিত ফায়াগ্রাস ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ফেইসবুকের নিজস্ব গবেষণা ধ্বংসাত্মক ফলাফলের খোঁজ পেয়েছে। যাদের টেকনিক্যাল সেক্টর শুধু লাভের মানসে এমন বিষয় বা প্রোগ্রাম বানায় এবং প্রচার করে যা শিশুদের মানসিক এবং দৈহিক এবং এক পর্যায়ে তাদের জীবনের জন্য হুমকির কারণ হিসেবে সামনে আসে। তাই পিতা-মাতার দেখা উচিত যে, তাদের শিশুরা কী দেখছে এবং তাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়া উচিত। তাদের জন্য কী জিনিস ক্ষতিকর আর কী কল্যাণকর– তা তাদেরকে বুঝানো উচিত যেন তাদের শিশুরা আত্মহত্যার পথ বেছে না নেয়। আমি আপনাদের সকলকে একথাও স্মরণ করাতে চাই যে, পাশ্চাত্যের সুখ এবং বিলাসী জীবনে বসবাস করে আপনাদের শিকড় বা আপনারা কোথা থেকে এখানে এসেছেন তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। পাশ্চাত্যের বসবাসকারী বেশিরভাগ আহমদী বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে এসেছে। ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে তারা এখানে এসেছে। তারা ব্যবসায়ী হোক বা পেশাজীবী অথবা শ্রমিক বা ছাত্র, সমাজে তাদের অবস্থা যা-ই হোক না কেন, পাকিস্তানের আহমদীরা স্বদেশে অন্যায়-অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছে। ছোট ছোট আহমদী ছেলে-মেয়েরা অর্থাৎ প্রথম শ্রেণি বা দ্বিতীয় শ্রেণির আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের অন্য শিশুরা কষ্ট দেয় বা অত্যাচার করে এমনকি শিক্ষকরা বঞ্চনা দেয়। এসব বিষয় তাদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির বেশ কিছু প্রফেসর ও আহমদী শিক্ষকরা আহমদীয়া বিরোধী অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। একদিকে সেখানের আহমদীরা দৈহিক নির্যাতন এবং সন্ত্রাসী আক্রমনের শিকার হচ্ছে অন্যদিকে মানসিক অত্যাচারেরও শিকার হচ্ছে। এর ফলে অনেক আহমদী পাকিস্তান ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে তথা বহির্বিশ্বে উন্নত জীবনের সন্ধানে তারা বের হচ্ছে। বহির্বিশ্বে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের আশায় তারা দূর-দূরান্তের কষ্টসাধ্য সফর করে আসে। সত্যিকার অর্থে অনেক আহমদী বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন থাকে। তারা এমন জীবনের সন্ধানে থকে যেখানে তাদের সন্তানদের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা থাকবে। যে জায়গাতে গিয়ে তাদের সন্তানেরা ভালভাবে এবং স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারবে। পাশ্চাত্যে বসবাসকারী সব আহমদী যারা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করছে আর সুন্দর জীবনযাপন করছে এক্ষেত্রে তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এটি তাদের ওপর অনেক বড় দায়িত্বভার ন্যাস্ত করে। আপনাদের বা আপনাদের পিতা-মাতার বা পিতামহের এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল আপনারা যেন এখানে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করতে পারেন তাই সেই দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করা আপনাদের জন্য আবশ্যক। এই বস্তুবাদিতায় না হারিয়ে গিয়ে ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী জীবনযাপন করা আবশ্যক। আপনারা এখানে যেসব সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন সেগুলোকে মূল্যায়ন করা আবশ্যক। যেমন পাশ্চাত্যে বসবাসকারী আহমদী মেয়েরা ভাল ভাল কলেজে পড়ালেখা বা স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছেন। এখানে অনেক উন্নতি করার সুযোগ আছে। কিন্তু পাকিস্তানে আহমদী মেয়েদের সেরকম সুযোগসুবিধা দেয়া হয় না। বরং প্রতিদিন তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, নির্যাতন, অত্যাচার, অনাচার ও অবিচারের শিকার হচ্ছে। তাই স্মরণ রাখবেন, নিজেদের অতীতকে ভুলে যাবেন না। পড়ালেখায় উন্নতি করার চেষ্টা করার পাশাপাশি স্মরণ রাখবেন, আপনার ধর্ম যেন সমস্ত জাগতিক আর বৈশ্বিক বিষয়ের ওপর প্রাধান্য পায়। যদি এরূপ করতে পারেন তাহলে আপনারা এ জীবন নিয়ে গর্বিত হতে পারবেন এবং আপনাদের এই জীবন যেখানে আপনাদের জন্য হিতকর হবে সেখানে দেশের জন্যও কল্যাণকর হবে। এছাড়া দেশের ভাল নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করুন। আপনার যে যোগ্যতা আছে তা অন্যের হিত-সাধনে কাজে লাগান এবং সুন্দর সমাজ গঠনে আপনার ভূমিকা পালন করুন। আপনাদের সমাজের সাথে মেশার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু একই সাথে আমি অতীতেও বলেছি যে, দেশের মূল ধারার অংশ হওয়ার অর্থ নিজের নৈতিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দেয়া নয় বরং পাশ্চাত্য সমাজের অংশ হওয়ার উপায় হল, দেশের উন্নতিকল্পে যেখানে ভূমিকা রাখবেন সেখানে নিজের পরিচয় ভুলবেন না। বরং পাশ্চাত্যে বসবাস করা অবস্থায় একজন আহমদীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। নিজ নৈতিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দেয়া কোনভাবে নিজ দেশের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হবে না। নাইট ক্লাবে যাওয়া, সেখানে নারী-পুরুষ মেলামেশা করা, নাচগান করা– এগুলো কখনও দেশের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। পাবে যাওয়া বা বারে গিয়ে মদ পান করা আর নিজের সমস্ত পবিত্রতা এবং বিবেক আর কাণ্ডজ্ঞানকে পদদলিত করা কোনভাবে জাতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। এখানে তথাকথিত স্বাধীনতার নামে আরও অনেক এরকম অনৈতিক কার্যকলাপ বা ক্ষতিকর বিষয়াদি আছে যেগুলোকে সমাজের জন্য আবশ্যক মনে করা হয় । কিন্তু স্পষ্ট মনে রাখা

উচিত যে, এমন পাপে জড়ানো এবং এরকম অনৈতিক গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়ার ফলে কেউ কখনও স্বাধীন হয় না আর এটি জাতির জন্য কোন দিন কল্যাণকর হয় না। অপরদিকে এমন কার্যক্রম মানুষকে খোদা থেকেও দূরে নিয়ে যায় বা খোদা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তাই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর হওয়ার পরিবর্তে অনৈতিক কার্যলাপ দেশেরই ক্ষতি করে আর সমাজের নৈতিক কাঠামো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। তাই সব আহমদী নর-নারী, ছোট-বড় সকলকে স্মরণ রাখতে হবে, উন্নত নৈতিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ হওয়া এবং ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করা আর আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের মাধ্যমে জাতির সেবা করা সম্ভব এবং জাতির প্রতি অনুগত হওয়া সম্ভব। কিন্তু পরিতাপের সাথে বলতে হয়, যারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বেশি সভ্য মনে করে এবং আধুনিক বিশ্বে যারা নিজেদেরকে উন্নত মনে করে তারা চরিত্রহীনতার বা অশ্লীলতার যে ক্ষতিকর দিক আজকের সমাজে প্রকাশ পাচ্ছে সেগুলো স্বীকার করে না। আল্লাহই ভাল জানেন তারা কখন বুঝবে তবে একদিন অবশ্যই তারা তাদের আচারআচরণের ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝতে পারবে আর একদিন স্বীকার করবে যে, মানুষ অনেক বেশি লাগামহীন স্বাধীনতার অনুসরণ করছে। কিন্তু তখন তা থেকে ফিরে আসা বা সমাজে উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই আহমদীদেরকে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে দাঁড়ানো উচিত। যদি আমরা এই লক্ষ্য অর্জনে সফল হই আর অন্যরা যদি নিজেদের ভুল বুঝতে পারে তাহলে আমরা তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে পারব এবং তাদেরকে বিকল্প এবং সঠিক উন্নতির নৈতিক পথ দেখাতে পারব। আমি আশা রাখি এবং বিশ্বাস রাখি যে, আমাদের জামা'ত সমাজকে রক্ষা করার জন্য এবং সমাজকে নৈতিক অধঃপতন থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা

করছে। তাই পাশ্চাত্যে বসবাসকারী আহমদী হিসেবে সত্যিই যদি সমাজের জন্য কিছু করতে চান, অবদান রাখতে চান আর তারা যে এখানে আপনাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে বা আপনাদের উন্নতি করার সুযোগ দিয়েছে, এর জন্য এই দেশের প্রতি যদি সত্যিকার অর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চান তাহলে এর সর্বোত্তম উপায় হল, ধর্মকে জাগতিক বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিন। সত্যিকার কৃতজ্ঞতার দাবী হল, আল্লাহর অধিকার প্রদান করা এবং মানুষের প্রাপ্য প্রদান করা। আর নিজেকে সকল অশ্লীল এবং অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করা– যা মানুষকে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেয়। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার পাশাপাশি এ বিষয়টিও নিশ্চিত করবেন যে, আপনি জাতিকেও অনৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। নিঃসন্দেহে তারা এমন একটি অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে যেখানে তাদের নৈতিক আদর্শগুলো হারিয়ে যাচ্ছে এবং স্বাধীনতার নামে এমনটি হচ্ছে। এটি সমাজকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে এমন পরিবর্তন সমাজের অধিকাংশ মানুষের মাঝে বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তা ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করছে। সত্যিকার অর্থে কিছু ভাল প্রকৃতির মানুষ এ সম্পর্কে এখন মুখ খুলছেন এবং সমাজের অবক্ষয়ের দিকগুলো তারা স্পষ্টভাবে তুলে ধরছেন। তারা জিজ্ঞাসা করছে, আমরা কেন আমাদের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধগুলো ছেড়ে দিচ্ছি– এ বিষয়ে তারা প্রশ্ন তুলছে। কিছু সৎ সাংবাদিক এবং নেতারা এসব সম্পর্কে কলাম লিখছেন। সমাজের অবক্ষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করছেন। তারা বলছেন যে, মূল্যবোধ খুব দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে বা অধঃপতিত হচ্ছে। সত্য কথা হল ধর্ম বা বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন ভাল প্রকৃতির মানুষ সৎ মানুষ সমাজের এমন অধঃপতন সহ্য করতে পারে না যেখানে মানুষ ও পশুর মাঝে পার্থক্য করা দুষ্কর। তাই পাশ্চাত্যে বসবাসকারী আহমদী মুসলমান হিসেবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব হল, নিজেদের নৈতিক মূল্যবোধের সুরক্ষা করা এবং আমরা যে সমাজে বসবাস করছি সে সমাজ যেন মূল্যবোধের উন্নত পর্যায়ে পৌছায়– এটি নিশ্চিত করা। এছাড়া হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের সদস্য হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল, সত্য ইসলামের বাণী অন্যদের কাছে প্রচার করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রজ্জ্বলনকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রদীপ যদি আমরা প্রজ্জ্বলিত রাখি তাহলে ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে খোদা তা'লার সাহায্য লাভ করব। কেবল তবেই আমরা বিশ্বের সামনে এক খোদার ইবাদতকারী, খোদার নির্দেশ মান্যকারী জাতি এবং জগত পূজারী জাতির মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারব। কেবল তবেই আমরা আমাদের সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য আছে সেটি অন্যদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝাতে পারব। আর তা হল, এক

আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার নৈকট্য সন্ধান করা। কেবল তবেই আমরা আমাদের ধর্মীয় মানকে উন্নত করতে সক্ষম হব, আধ্যাত্মিক মানকে উন্নত করতে পারব, অন্যদেরকে পথের দিশা দিতে পারব আর পৃথিবীকে বুঝাতে পারব যে, আমরা তারা যারা সত্যিকারের শান্তি এবং তৃপ্তি লাভ করেছি। আর তা সম্ভব হয়েছে আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং মূল্যবোধকে অনুসরণ করার মাধ্যমে। প্রথম দৃষ্টিতে পৃথিবীর চাকচিক্য যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, কখনও তা স্থায়ী মানসিক প্রশান্তির কারণ হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, "আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নাল কুলুব" তথা শুন! হৃদয়ের প্রশান্তি আল্লাহ্‌র স্মরণের মাঝেই নিহিত। আমাদের জানা আছে, এটি শুধু কুরআনের একটি দাবী নয় বরং এটি মুত্তাকি লোকদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। আমাদের জামা'তের খোদাভীরুদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। এটি একথার সাক্ষ্য বহন করে যে, সত্যিকার হৃদয়ের প্রশান্তি পৃথিবীর অর্থহীন বিনোদন এবং বিলাসিতার মাঝে নয় বরং খোদা তা'লার ইবাদত এবং খোদার স্মরণের মাঝে নিহিত। আমি এখানে এ কথাটিও স্পষ্ট করতে চাই যে, কিছু ভাল বিনোদনও আছে যেগুলো অনুসরণ করা উচিত যেমন শরীরচর্চা। শারীরিক বা দৈহিক ব্যায়াম ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এমন বিনোদন বা এমন খেলাধুলা যা আল্লাহ্ এবং বান্দার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যা বস্তুবাদিতার ও লোভলালসার জন্ম দেয়, সেগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। এমন বিনোদন স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয় এবং আধ্যাত্মিকতার জন্যও ভাল নয়। বরং এটি মানুষের দুশ্চিন্তাকে বৃদ্ধি করে। বরং তথাকথিত এধরনের বিনোদন অনেক ক্ষতিকর হয়ে থাকে, বলা চলে লোনাপানির মত হয়ে থাকে তথা যে লোনাপানি পিপাসা নিবারণ করার পরিবর্তে পিপাসা বৃদ্ধি করে। এক ব্যক্তি যার মাঝে বুদ্ধি নেই, প্রজ্ঞা নেই বা মেধা নেই, সে লোনা-পানি পান করতে থাকবে। কিন্তু সে দেখবে যে এটি তার পিপাসা নিবারণ করার পরিবর্তে তার পিপাসা বৃদ্ধি করছে। লোনা-পানি পান করার মাধ্যমে কখনও পিপাসা নিবারণ হয় না বরং এর ফলে শরীর বিষিয়ে তোলে এবং অবশেষে মানুষ মারা যাবে– একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সর্বোত্তম পানি সেটি যা আকাশ থেকে বৃষ্টি আকারে আসে আর এটি পৃথিবীতে জীবন এবং অস্তিত্ব নিশ্চিত করে। এছাড়া ভূগর্ভস্থ স্বচ্ছ পানি ভূমিকে জীবিত করে এবং সকল প্রকার প্রাণ এটি থেকেই জীবন লাভ করে। সমাজের এই বিষাক্ত চাকচিক্য আসলে বিষের মত, তাই সমাজের বিষাক্ত চাকচিক্য থেকে আমাদের নিজেদেরকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে বিষের পিছে না ছুটে আমাদের সেই আধ্যাত্মিক পানির অনুসরণ করা উচিত যা প্রাণদায়ী। যা আমাদের আত্মাকে জীবিত করে। এটি সেই সুমিষ্ট পানি যা আমাদের মনের প্রশান্তি উপহার দিবে। আর এটি শুধুমাত্র খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব এবং খোদার নির্দেশাবলী অনুসরণের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। তাই পাশ্চাত্যে বসবাসকারী সকল আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত, কিছু স্বাধীনতা যা আমরা এখানে উপভোগ করি সেটি কি সত্যিই স্বাধীনতা নাকি এগুলো তিক্ত ট্যাবলেট যার ওপর শুধু চিনির প্রলেপ লাগানো হয়েছে। এমন স্বাধীনতা যার ফলে পাপ এবং অনৈতিকতা জন্ম হয়। এর ফলে লাভজনক কিছু সামনে আসতে পারে না। এর ফলে দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি পায়। আর এর ফলে পরিবারগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। জাতি-গোষ্ঠির মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। অনেক যুবক বলে থাকে যে, জামা'ত যেসকল বিধি-নিষেধ আরোপ করে এর ফলে তাদের স্বাধীনতা খর্ব হয়। কিন্তু তারা যদি চিন্তার করে বা বিশ্লেষণ করে যে, জামা'ত প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করে এর ফলে কারও কোন অধিকার খর্ব হয় না। পক্ষান্তরে এগুলো সত্যিকার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। সত্যিকার অর্থে মানুষকে স্বাধীন করে। গুটিকতক আহমদী যুবক-যুবতী পাশ্চাত্যের ভাবধারায় মারাত্মকভাবে প্রভাবিত। তারা নিজেদের বিশ্বাসকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ধর্মকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে তারা অনুশোচনাও করে বা স্বীকার করে যে, তারা স্বাধীনতার নামে অন্ধভাবে জাগতিকতার অনুসরণ করছে। পরে তারা অনুশোচনা করে জামা'তেও ফিরে আসে। এধরনের ঘটনাও ঘটেছে। স্মরণ রাখবেন এক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কোন কাজ করার পূর্বে উক্ত কাজের ক্ষতিকর এবং কল্যাণকর দিকগুলো নিয়ে চিন্তা করে। একজন সত্যিকার মু'মিন বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করে। সে কেবল তার কাজের ক্ষতিকর এবং উপকারের দিকগুলো নিয়েই চিন্তা করে না বরং কোন কাজ করার আগে ধর্মীয় উপকার এবং ক্ষতি নিয়েও চিন্তা করে। প্রত্যেক মু'মিন চিন্তা করে দেখে যে, সে যে কাজ করছে তা কি ইসলামসম্মত? তাই আমি পুনরায় টিভি, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার বিষয়ে আসতে চাই। যদি নিজেদের এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে চান, নিজের পরিবারকে বাঁচাতে চান তাহলে আপনাকে বুদ্ধি ব্যয় করতে হবে। বুদ্ধি বাড়ায়, এমন শালীন কন্টেইন্ট আপনাকে দেখতে হবে। এমন কোন প্রোগ্রাম দেখবেন না যা খোদা থেকে আপনাকে দূরে নিয়ে যায়। যদি এমনটি করেন তাহলে অন্যদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকার পরিবর্তে আপনি নিজেই আল্লাহ্ থেকে দূরে চলে যাবেন। অনুরূপভাবে আহমদী নারী এবং আহমদী মেয়েদেরকে সবসময় স্মরণ রাখতে হবে, যে ফ্যাশনের নামে বা অত্যাধুনিক ট্রান্ডের অনুসরণের নামে নিজেদের শালীনতাকে জলাঞ্জলি দেয়া উচিত নয়। অনেক মহিলা নিজেদের মাথা ঢেকে মনে করে যে, এটিই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে পর্দার নামে ওভারকোট পরে। কিন্তু তাদের কনুই পর্যন্ত খোলা

থাকে অথবা বাহু পর্যন্ত খোলা রাখে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা পরিষ্কারভাবে কুরআনে বলেছেন, পর্দার দাবী হল জনসমক্ষেও নিজেকে পুরোপুরি আবৃত করা। ঢিলাঢালা পোশাক পরা উচিত যেন তার বক্ষ এবং কলার খোলা না থাকে। আহমদী মহিলাদের এদিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। তাদের নিজেদের শালীনতা এবং সম্ভ্রমের সুরক্ষা করা উচিত। আর এটি যদি কেউ না করে তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে। আল্লাহ্ যে সমস্ত বিধিনিষেধ বেঁধে দিয়েছেন, নিজের গাম্ভীর্য এবং সম্মান বজায় রাখার জন্য সেগুলোকে কেউ যেন পদদলিত না করে। সদা স্মরণ রাখবেন, ইসলাম ধর্ম আপনাদের ওপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করে সেগুলো আপনাদের সম্মান এবং সম্ভ্রমের সুরক্ষার জন্য করে এবং সমাজের হুমকি থেকে আপনাদের সুরক্ষার জন্য করে। আপনারা স্কুল বা কলেজে যেখানে পড়ালেখা করবেন সেখানে ছেলেদের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঘনিষ্ঠ হবেন না। যা ক্ষতিকর তা আপনাদের এড়িয়ে চলতে হবে। আপনাদের পড়ালেখা কিংবা শিক্ষার যে সুযোগসুবিধা আছে, নিজের মানকে উন্নত করার জন্য সেগুলো কাজে লাগান কিন্তু এ স্বাধীনতা যেন কোনভাবে আপনার জন্য বা অন্যদের জন্য অভিশাপ প্রমাণিত না হয় বা ক্ষতিকর প্রমাণিত না হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেখানে অনেক আহমদী পুরুষ এবং মহিলা সঠিকভাবে মূল্যবোধগুলোকে দৃষ্টিতে রাখে না, যার ফলে পরিবার ভেঙ্গে যায়, যেখানে অবাধ মেলামেশা একটা সাধারণ বিষয়। ইসলাম যে নৈতিক শিক্ষা দেয় আহমদী নর-নারীর সে নৈতিক শিক্ষার মাঝে জীবনযাপন করা উচিত। যেসব বিষয় আপনাদের সম্মান, পরিবারের সম্মান, জামা'তের সম্মানকে গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং শালীন করে সেগুলোকে সুরক্ষা করা উচিত। আপনাদের সম্মান, আপনার

পরিবারের সম্মান অতি মূল্যবান জিনিস যা আপনাকে সুরক্ষা করতে হবে। অনেক মহিলা আমাকে লিখে যে, তারা এবং তাদের মেয়েরা মনে করে যে পর্দা হল শুধু মনের ব্যাপার। তাই পোশাক পরিধানের মাধ্যমে দৈহিক শালীনতা প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন নেই। অথচ এটি ভুল কথা বা ভ্রান্ত কথা। সমাজের প্রভাবে মানুষ এভাবেই আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে যায়। আমি যা বলছি তা পাকিস্তান এবং এশীয় সংস্কৃতির কথা বলছি না বরং তারা যেই দেশেই বসবাস করুক না কেন বা যে দেশের অধিবাসীই হোক না কেন, এগুলো ইসলামের সার্বজনীন শিক্ষা যা সকল মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। অতএব পাকিস্তানী হোক বা এশীয়, যুক্তরাজ্যের হোক বা আমেরিকান, ইউরোপের হোক বা আফ্রিকান অথবা বিশ্বের যে কোন প্রান্তে থাকুক না কেন, এক আহমদী মুসলমান নারীর ইসলামী শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করা উচিত এবং শালীন মূল্যবোধের সুরক্ষা করা উচিত। অধিকাংশ আহমদী নারী যারা এখানে বসবাস করে তারা হয়ত পাকিস্তান থেকে এসেছে বরং তাদের জ্যেষ্ঠরা পাকিস্তান থেকে হিজরত করে এখানে এসেছে। তাই তাদের সেসব ধর্মীয় মূল্য জলাঞ্জলি দেয়া উচিত নয় যা তাদের জ্যেষ্ঠরা অনুসরণ করত বরং অন্যদের জন্য এখানে তাদের শালীনতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত কেননা তারা আপনাদের কাছে শিখবে এবং আপনাদের আচরণের মাধ্যমে তারা দৃঢ়প্রত্যয়ী হবে। আর একইভাবে আপনাদের যদি আত্মবিশ্বাস থাকে আর আপনারা যদি ধর্মীয় বিষয়ে সকল হীনমন্যতার উর্ধ্বে থাকেন তাহলে এটি তবলীগের পথকে সুগম করবে আর পৃথিবীর এই অংশে ইসলাম প্রচারের সুযোগ করে দিবে। আবারও স্মরণ করাচ্ছি, কিছু ইংরেজ এবং ইউরোপিয়ান নারী ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা জামা'তের আদর্শ মহিলা। তারা নিজেদের জীবনে এক বৈপ্লবিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক পরিবর্তন এনেছে। তারা এমন উন্নত শালীন পোশাক পরিধান করে যা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। ভেবে দেখুন, এমন ইংরেজ এবং ইউরোপিয়ান নারীরা যারা এ সমাজে বড় হয়েছে, অমুসলমান ঘরে প্রতিপালিত হয়েছে, তারা যদি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, শালীন পোশাক এবং শালীন আচরণের মাধ্যমে গাম্ভীর্য এবং সম্মান লাভ করা সম্ভব তাহলে সে সব আহমদী মুসলমান দেশ থেকে এসেছে বা যারা মুসলমান ঘরে বড় হয়েছে তাদের বিষয়ে কী বলবেন? এ জামা'ত অবশ্যই উন্নতি করবে এবং উন্নতির রাজপথে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু আপনারা যদি নিজেদের বিশ্বাসের সুরক্ষা না করেন আর হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুসারে জীবনযাপন

না করেন তাহলে অন্য জাতি বা অন্যরা আমাদের জামা'তে যোগ দিবে এবং তারা জামা'তের বা ইসলামের পতাকাবাহী হবে। তারাই ইসলামের শিক্ষা প্রচার করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যারা পূর্বে মুসলমান ছিল তারা পিছনে থেকে যাবে। তাই হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-কে যদি মেনে থাকেন তাহলে আপনার বয়আতের যে অঙ্গীকার আছে সেটি রক্ষা করা উচিত। জাগতিক প্রভাব যেন আপনাকে এথেকে দূরে ঠেলে দিতে না পারে। আমি দোয়া করব আল্লাহ তা'লা আপনাদের সবাইকে সেই সামর্থ্য দিন অর্থাৎ আমি যা বলেছি তা মেনে চলার সামর্থ্য দিন। সত্যিকার অর্থে লাজনা ইমাইল্লাহ তারা হবে যারা পাপ থেকে মুক্ত থাকবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ইবাদতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে। আমার অনুরোধ থাকবে, আপনারা বৃথা কার্যকলাপের পিছে ছুটবেন না। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে এমন জাগতিক বিলাসিতার পিছনে ছুটবেন না। সবসময় স্মরণ রাখবেন যে শুধু নিজেদেরকে বা নিজেদের সন্তানদেরকে রক্ষা করে চলবেন না বরং আপনারা ইসলামের এবং আহমদীয়াতের বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচারের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করবেন। মানবজাতির হৃদয় জয় করা আপনাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যেন সারা পৃথিবীর মানুষ মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকা তলে আশ্রয় নেয়। এটি এক মহান দায়িত্ব যা আল্লাহ তা'লা হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ)-এর জামা'তের ওপর অর্পণ করেছেন। আর আহমদী নর-নারীর এ দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক। যদি এই চ্যালেঞ্জ আপনারা গ্রহণ করেন আর পৃথিবীতে যদি এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনতে চান তাহলে প্রথমে নিজেদের সংশোধনের মাধ্যমে এই কাজ আরম্ভ করতে হবে। তাই নিজের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করার চেষ্টা করুন। আর আল্লাহ্‌র সাথে নিজের সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক মনোনিবেশ করুন এবং দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ আপনাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। যেন আপনারা সেসব লোকদের মাঝে গণ্য হতে পারেন যারা নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করে চলে। আল্লাহ্ তা'লা দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর জ্ঞান রাখেন– একথা কখনও ভুলবেন না। আপনারা কি করছেন তা কেউ দেখার না থাকলেও মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'লা তা দেখছেন। তাই শুধু আল্লাহর খাতিরে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলুন। নিজেদের বিশ্বাসের সুরক্ষা করুন। নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে লালনপালনের যে দায়িত্ব আছে তা সর্বতোভাবে পালন করার চেষ্টা করুন। পৃথিবীতে এক ধরনের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনা আমাদের দায়িত্ব। তাই সন্তানদের প্রশিক্ষণ দিন তারা যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার তৌফিক দিন। আপনারা আহমদীয়াতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে উদ্ভাসিত হোন। আল্লাহ তা'লা লাজনা ইমাইল্লাহ্‌কে সকল ক্ষেত্রে উন্নতি দিন। (আমীন)

*ভাবানুবাদ: পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ডেস্ক*

কবিতা

# খেলাফতে আহমদীয়া

**সোহেল মাহমুদ**

অমানিশা ভেঙে ধরণীর বুকে
দেখালো আলোর পথ।
নূরানী নবীর নূরে ঝলমল
আহমদী খেলাফত।

ভুলে জাতিভেদ, শান্তির বাণী
ছড়াবো বিশ্বময়।
শ্রেষ্ঠ নবীর সেরা উম্মত
আমাদের পরিচয়।

তরবারি নয়,নয় বিদ্বেষ
প্রণয়ের জাগরণে,
আমরা ছুটেছি, ছুটে চলবোই
খোদার অন্বেষণে।

তোমরা যারা ক্রোধের আগুন
মগজে রেখেছো ভরে,
আমরা সেখানে আবে জমজম
ঢেলে দেই ঘরে ঘরে।

সাড়ে সাতশো কোটি মানুষের
হাতে রাখি প্রিয় হাত।
ঘুঁচাতেই হবে অন্ধকারের
বিষাক্ত কালো রাত।

চৌদ্দশত বছরের দীপ
নিভে যায় তাঁর নাম।
যুগ-খলীফার স্বর্গীয় হাতে
জেগে উঠে ইসলাম।

চোখের পাতায় আর কত ঘুম
আর কত শুয়ে রবে?
ডাকছে বেলাল, আসছে প্রভাত
জেগে উঠতেই হবে ॥

**********

# মানবসেবা-ই হোক ব্রত

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

خدمتِ دین کو اک فضلِ الٰہی جانو
اس کے بدلہ میں کبھی طالبِ انعام نہ ہو

অর্থাৎ ধর্মের সেবা ঐশী কৃপা হিসেবে জানবে, এর বিনিময়ে কখনও পুরস্কারের আশা করবে না।

যখন চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞানার্জনের জন্য পরিবার-পরিজন ছেড়ে সুদূর চীন যাই তখন প্রায়শ বন্ধুমহলে এই অধমকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুনতাম, কোথাও চাকুরি পাবে না, পেলেও বেতন কম হবে। আমি নীরবে সেগুলো শুনতাম কিন্তু কখনও সেই আলোচনায় যোগ দিতাম না। আমাকে নিয়ে উপহাস করে তারা বলত, "আরে, ওর কি এসব নিয়ে চিন্তা আছে? ও কোন চাকরি না করলেও চলবে।"

আমি কিন্তু সব সময়ই বলতাম, আমার চাকুরি নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই, আমি ওখান থেকে পাশ করে বাংলাদেশে ফিরলে জামা'তের হাসপাতালে সেবা দিয়ে যা-ই পাব, তা দিয়েই আমার দিন কেটে যাবে।"

ওরা অবাক হয়ে বলত, তোদের হাসপাতাল আছে? আমি বলতাম, নেই তবে ইনশাআল্লাহ্ হয়ে যাবে।"

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় বাংলাদেশে **'আহমদীয়া মেডিকেল সেন্টার'** প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এই মেডিকেল সেন্টার প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে আছে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বাংলাদেশের প্রতি সদয় দৃষ্টি এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাঝে কিছু পুণ্যাত্মার অসামান্য অবদান। এই মেডিকেল সেন্টার প্রতিষ্ঠার ফলে আমার সেবাদানের অভিপ্রায় পূর্ণ হয়েছে, তাই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে যখন পঞ্চগড়ের পথে যাত্রা করি তখনও আমি ভাবতাম, সেখানে চিকিৎসক হিসেবে মানুষের রোগ সারাতে যাচ্ছি। কিন্তু বাংলাদেশের ওয়াকফে নওদের সাথে গত ৩০ জানুয়ারী হুযূর (আই.)-এর মোলাকাতে আমার ভুল ভাঙে এবং আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত তা প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর কাছ থেকে জানতে পারি। সেই মোলাকাতে হুযূর (আই.) এ অধমকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "একজন ডাক্তারের মনে রাখা উচিত, রোগীর আরোগ্য আল্লাহ্ তা'লা দিয়ে থাকেন। এজন্য আপনারা যখন রোগী দেখবেন তখন দোয়ার মাধ্যমে দেখবেন এবং যখন ব্যবস্থাপত্র লিখবেন তখন এর উপরিভাগে লিখবেন 'হুয়া আশ-শাফী'। আমি এ কথা কোন এক খুতবায়ও বলেছিলাম যে, রোগী দেখার পর রাতে নামায পড়বেন তখন ঐসকল রোগীর জন্য দোয়া করবেন যাদেরকে আপনি দেখেছেন, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের আরোগ্য দান করেন এবং আপনার হাতে যেন আল্লাহ্ তা'লা আরোগ্য ও কল্যাণ দান করেন আর সকল রোগীকে আন্তরিকতার সাথে বিশেষ মনোযোগসহকারে দেখবেন। আপনি যদি তাদেরকে আন্তরিকভাবে এবং মনোযোগের সাথে সেবা করেন তাহলে মনে রাখবেন, রোগীদের অর্ধেক রোগ ডাক্তারের কথাতেই ভাল হয়ে যায় আর বাকী অর্ধেক ঔষধের মাধ্যমে ভাল হয়। তাই আপনারা যদি রোগীর সাথে উত্তম আচরণ করেন, তাহলে তাদের অর্ধেক রোগ এর মাধ্যমেই ভাল হয়ে যাবে। বাকি আপনারা ঔষধ দিন এবং দোয়া করুন তাহলে তারা সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

হুযূর (আই.) আরও বলেন, 'সেখানে যাও এবং অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে নিজেকে জামা'তের সেবায় উপস্থাপন কর'।"

সেই মোলাকাতের পর আমার উপলব্ধি এই যে, আমরা যারা এই ঐশী জামা'তে সেবক, আমাদের সকলের উদ্দেশ্য হল, সেবার মাধ্যমে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং জামা'তের জন্য বড় কিছু করছি– এটা না ভেবে জামা'তের খেদমত করতে পারছি, এটাকে সৌভাগ্য মনে করা আর জামা'তের দায়িত্বগুলোকে সুযোগ হিসেবে গণ্য করা এবং খলীফার আদেশকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করা। সকল আরাম-আয়েশকে পরিত্যাগ করে সৃষ্টির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা মহান আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। যেন এই ঐশী জামা'তের মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনে নিজেকে শামিল করতে পারি এবং সর্বোপরি জামা'তে আহমদীয়ার সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করে মহান আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন হতে পারি।

*ডাক্তার মোহাম্মদ আতাহার আহমদ*
*ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে খেদমতরত*
*আহমদীয়া মেডিকেল ষ্টোর*
*আহমদনগর, পঞ্চগড়*

# রাগ বা ক্রোধ সংবরণ

মাওলানা ফুরাদ আহমদ

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে রাগ বা ক্রোধ সংবরণ করা সম্পর্কে উপদেশবাণী দান করতে গিয়ে বলেন,

"সেইসব লোক, যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে আর যারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে; অতএব আল্লাহ্ (এমন) সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৩৫)*

এই আয়াতের সুবাদেই হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর একজন কৃতদাস মুক্তি লাভ করেছিল বলে জানা যায়।

কথিত আছে, ভুলক্রমে হোসেন (রা.)-এর ওপর তাঁর কৃতদাস পানি বা অন্য কোন গরম জিনিস ঢেলে দেয়। এতে তিনি (রা.) খুবই ক্রোধের দৃষ্টিতে সেই কৃতদাসের দিকে তাকান। সেই কৃতদাস ছিল চৌকস এবং তার কুরআনের জ্ঞানও ছিল এছাড়া উপস্থিত বুদ্ধিও ছিল প্রখর। তখন সেই কৃতদাস বলল "ওয়াল কাযিমিনাল গাইযা" (তথা 'আর যারা রাগ দমন করে')। এই কথায় হোসেন (রা.) বলেন, "ঠিক আছে, রাগ সংবরণ করলাম"। তখন সেই কৃতদাসের ধারণা হল, রাগ তো দমন করেছেন কিন্তু অন্য কোন সময় অন্য কোন ভুলের কারণে আবার না প্রহারের শিকার হই, তাই সে আবারও বলে উঠল, "ওয়াল আফিনা আনিন নাস" (তথা 'আর মানুষকে মার্জনাকারী')! তখন হোসেন (রা.) আবারও বললেন, "ঠিক আছে, যাও ক্ষমাও করলাম। জ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধি আবারও তার কাজে আসল। সেই ব্যক্তি সাথে সাথেই বলতে লাগল, ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনীন" (তথা 'আর আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন')। হোসেন (রা.) বললেন, যাও তোমাকে স্বাধীন করে দিলাম। সে যুগে কৃতদাস ব্যবসার প্রচলন ছিল, কৃতদাসদের সহজে মুক্তি লাভ হত না। তবে এই কৃতদাসের উপস্থিত বুদ্ধি ও জ্ঞান এবং প্রভুর তাকওয়া কাজে দিল ফলে সে কৃতদাসের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তিলাভ করল।

নিশ্চয় সবার স্মরণ আছে, আমরা ১০টি শর্তে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি। বয়আতের চতুর্থ শর্তে যেমনটি বলা আছে যে, রাগান্বিত হয়ে বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, আমিত্বের কারণে, মিথ্যা আত্মাভিমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে নিজ হাত দ্বারা বা কথার মাধ্যমে কাউকে দুঃখকষ্ট দিবে না। বাস্তবিকপক্ষেই এটা এক আবশ্যকীয় শর্ত তথা, কোন মুসলমানকে দুঃখ দেব না। তাই এটি বিশেষভাবে মেনে চলা আমাদের জন্য আবশ্যক।

রাগ বা ক্রোধ সংবরণ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, "সে বীরপুরুষ নয় যে কুস্তিতে অপরকে ধরাশায়ী করে বরং বীরপুরুষ তো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধ ও উত্তেজনার মুহূর্তে আত্মসংযমী হয়, রাগ দমন করে। (সহীহ্ বুখারী)

"একবার এক লোক মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করল, "আমাকে কোন উপদেশ দিন"। তিনি (সা.) বললেন, ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি বারবার উপদেশ প্রদানের জন্য নবীকে (সা.)-কে পীড়াপীড়ি করল। তিনি (সা.) প্রত্যেকবারই বলেন, ক্রোধান্বিত হয়ো না।" *(সহীহ্ বুখারী)*

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, "ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হতে আর শয়তান আগুনের তৈরি। বস্তুত আগুন পানি দ্বারা নির্বাপিত হয়। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ ক্রোধান্বিত হয় তখন সে যেন ওযু করে নেয়।" *(আবু দাউদ)*

আরও একবার মহানবী (সা.) বলেন, "যখন তোমাদের মাঝে কেউ ক্রোধান্বিত হয় তখন যদি সে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে তবে যেন সে বসে যায়। যদি এতে রাগ চলে যায় তবে ভাল, অন্যথায় সে যেন শুয়ে পড়ে।" *(তিরমিযী)*

"হযরত সোলায়মান ইবনে মুরাদ (রা.) বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে বসা ছিলাম। এ সময় দুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদ ও গালমন্দে লিপ্ত ছিল। একজনের চেহারা তো রাগে লাল হয়ে গিয়েছিল এবং ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি এমন একটি কথা জানি যা বললে তার এই অবস্থা অবশ্যই দূর হয়ে যাবে। সে যদি "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" বলে তবে তার এ রাগের ভাব চলে যাবে। সাহাবীগণ তাকে বলেন, মহানবী (সা.) আউযুবিল্লাহ্ কথাটা বলে তোমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

হযরত আলী (রা.) আমাদের জন্য রাগ সংবরণের এক অন্যান্য দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

একদা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে এক কাফেরের মল্লযুদ্ধ হয়। এক পর্যায়ে তিনি (রা.) সেই কাফেরকে ধরাশায়ী করে ফেলেন এবং তার বুকের ওপর বসে তরবারি দিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হন। ঠিক তখনই সেই কাফের ব্যক্তি নিচ থেকে তাঁর (রা.) মুখে থুথু দিয়ে দেয়। হযরত আলী (রা.) তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে উঠে পড়েন। সেই কাফের জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাকে বাগে পেয়েও কেন ছেড়ে দিলে? তখন তিনি (রা.) বললেন, পূর্বে আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে তোমার সাথে যুদ্ধ করছিলাম। কিন্তু যখন তুমি আমার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়েছ, তখন তা আমার ব্যক্তিগত ক্রোধে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তাই আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। একথা শুনে সেই কাফের মুসলমান হয়ে যায়।

রাগ বা ক্রোধ যে কত ভয়াবহ তার বর্ণনা দিতে গিয়ে যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, "এই পৃথিবীতে বহু এমন মানুষ আছে যাদের জীবন এক অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় অতিবাহিত হয় কেননা তারা এই বিষয়ে কোন খবরই রাখেন না যে, তারা পাপ করছে বা পাপ কাকে বলে। জনসাধারণ তো দূরের কথা, অনেক শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষও জানে না যে, সে পাপ করছে অথচ সে অনেক পাপে জড়িত হয়ে যায় এবং পাপ করতে থাকে। পাপ সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত অবগত না হবে এবং মানুষ তা থেকে বাঁচার চিন্তাভাবনা না করবে ততক্ষণ এই জীবন থেকে না তার কল্যাণ লাভ হবে আর না-ই অন্যের কল্যাণ হবে, যদিও বা সে ১০০ বছর জীবন লাভ করুক না কেন। কিন্তু যখন মানুষ পাপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাবে এবং তা থেকে দূরে থাকবে তখনই সেই জীবন মঙ্গলজনক জীবন হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ চেষ্টাপ্রচেষ্টা করবে এবং নিজের অবস্থা ও চরিত্রকে বিশ্লেষণ করবে, ততক্ষণ এটি সম্ভব নয় কেননা অনেক পাপ স্বভাবগত বা প্রকৃতিগত হয়ে থাকে যেমন– রাগ, জুলুম, শত্রুতা, উত্তেজনা, লৌকিকতা, অহঙ্কার, হিংসা, অনিষ্ট-কামনা ইত্যাদি। এসব মন্দ স্বভাব মানুষকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।" *(মলফুযাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬০৮-৬০৯)*

রাগের অনিষ্ট থেকে মুক্তির জন্য মহানবী (সা.) আমাদেরকে একটি দোয়া শিখিয়েছেন আর দোয়াটি হচ্ছে,

**"আল্লাহুম্মাগফিরলি যামবি ওয়া আযহিব গাইযা ক্বালবি ওয়া আজিরনি মিনাশ শাইতানির রাজীম।"** অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও। আর আমার অন্তর থেকে রাগ বা ক্রোধ দূর করে দাও এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আমাকে তোমার আশ্রয়ে নিয়ে নাও। *(দোয়াইয়্যাহ খাযায়েন, পৃষ্ঠা: ৬৯)*

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে রাগ বা ক্রোধ দমন করে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হওয়ার সৌভাগ্য দিন, আমীন।

# 'আহমদী' নাম কেন?

অনেকে আপত্তি করে বলে, মির্যা সাহেব নিজ জামা'তের নাম 'আহমদী' কেন রেখেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কেবলমাত্র চিহ্নিত করার জন্য [এই জামা'তের নাম 'আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত] রাখা হয়েছে। কেননা মুসলমানদের মাঝে অনেক দল-উপদল রয়েছে। কেউ নিজেদেরকে হানাফী বলে, কেউ শাফেঈ বলে, আবার কেউ বলে 'আহলে হাদীস' ইত্যাদি ইত্যাদি। এ যুগে যেহেতু মুহাম্মদ (সা.)-এর 'জামালী' নাম 'আহমদ'-এর বহিপ্রকাশ হচ্ছে তাই এই জামা'তের নাম হয়েছে 'আহমদী' জামা'ত। বিশেষকরে এই (আহমদী) নামটি এ যুগের জন্যই নির্ধারিত ছিল। ইতোপূর্বে যদিও এমন অনেক ব্যক্তি সৃষ্টি হয়েছেন যারা বিভিন্ন জামা'তের ইমাম হয়েছেন আবার তাদের অনেকের নামের সাথে 'আহমদ' শব্দটিও সংযুক্ত ছিল কিন্তু খোদা তা'লা কখনও কোন জামা'তের নাম 'আহমদী' হতে দেন নি। যেমন ধরুন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, তাঁর জামা'ত এর নাম বলা হয় হাম্বলী। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ছিলেন যার জামা'তের নাম বলা হয় 'মুজাহেদীন'। সৈয়দ আহমদ আলীগড় ছিলেন যার সমমনাদের বলা হয় 'প্রকৃতিবাদী'। তাই ধারণা করা যায়, ইতোপূর্বে কোন জামা'তের নাম 'আহমদী' ছিল না।

*(আল-বদর, ৭ নভেম্বর ১৯০৭)*

# আমার মরহুম পিতা মোয়াল্লেম ইসরাইল দেওয়ান

মিসেস মুসলেহা জাফর

আমার আব্বা মরহুম ইসরাইল দেওয়ান সাহেব মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি একজন জন্মগত আহমদী ছিলেন। মরহুম সদর মোয়াল্লেম মৌলবী মনোয়ার আলী মুন্সী সাহেবের জামাতা ছিলেন। এছাড়া তিনি মরহুম সদর মোয়াল্লেম মৌলবী সলিম উল্লাহ সাহেবের একান্ত সহযোগী ছিলেন। আমার আব্বা প্রয়াত ন্যাশনাল আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের নিকট মোয়াল্লেম কোর্স সমাপ্ত করেন। তৎকালীন বাংলাদেশের প্রথম সারির তিনজন মোয়াল্লেমের মধ্যে আব্বা একজন ছিলেন। তার ঐকান্তিক আগ্রহ ও আমার চাচা ইসমাইল দেওয়ান সাহেবের প্রচেষ্টায় তিনি একজন ওয়াকফে জিন্দেগী হতে পেরেছিলেন। চাচা আব্বাকে পিতৃস্নেহে বড় করেছেন। আমার পিতা ৪২ বছর মোয়াল্লেম হিসাবে সুনামের সাথে জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। বাংলাদেশের দু'চারটি জামা'ত ছাড়া প্রায় সকল জামা'তে তালীম তরবিয়তের কাজ করেছেন। আব্বার প্রথম বদলি হয়েছিল মরহুম মৌলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব (অস্ট্রেলিয়া)-র দাদার বাড়ি চরদুখিয়া, চাঁদপুরে। বকশি বাজার দারুত তবলীগ মসজিদে যখন আমি মরহুম মাহমুদ সাহেবের নিকট দোয়ার আবেদন করি উনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতার স্মৃতিচারণ করেছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আব্বার একটি বিশেষ গুণ ছিল মানুষের ভালবাসা অর্জন করার ক্ষমতা। জামা'তের প্রত্যেকে আব্বাকে ভালবাসতেন। এর একটি কারণ আমি মনে করি এই যে, আব্বা একটি কথা বলতেন , আমি জীবনে কাউকে জেনেশুনে কষ্ট দিই নি, কথায় বা কাজে, কেউ অজান্তে কষ্ট পেয়েছেন কিনা জানি না। আমি নিজ বিয়ের পূর্বে এবং পরেও আব্বার আদর্শকে সবচেয়ে বেশি কাছ থেকে অবলোকন করতে পেরেছি । মোয়াল্লেম অবস্থায় জামা'তের দায়িত্ব পালনের সময় থাকাখাওয়ার অনেক কষ্ট হত। কিন্তু কখনও তার কাছে বিরক্তির কোন কথা আমরা শুনি নি বা তাঁর কোন কর্মে তিনি এর বহিঃপ্রকাশ করেন নি। আমাদেরকে বলতেন, জামা'তের জন্য এটুকু কুরবানী করতে পেরেছি এটিই আমার অনেক বড় পাওয়া। আব্বার সামান্য বেতনে মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে আল্লাহ্‌র অশেষ ফযলে আমরা পড়াশুনা করে সমাজের একটি প্রতিষ্ঠিত স্থানে অবস্থান করতে পেরেছি। অনেকে উনাদের স্ত্রীদের উপদেশ দিতে গিয়ে আমার মা-চাচির উদাহরণ দিয়ে বলেন, দেখ কত অল্প টাকায় সন্তানদের পড়াশুনা করিয়েছেন।

আব্বার কাছে আবেদন করেছিলাম, আমি আপনার ওয়াকফে জিন্দেগী জীবন নিয়ে বই লিখতে চাই। তিনি বলেছিলেন ঠিক আছে, কিন্তু খেয়াল রাখবে যেন কোন ধরনের অতিরঞ্জন করা না হয়। উনি যে কি আদর্শবান ছিলেন তা সকলের সামনে উপস্থাপন করছি। আমার ধারণা, এতে জামা'তের সদস্যগণ আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হবেন।

আমার বাবা ঘরে-বাইরে একই আদর্শের অধিকারী ছিলেন। আব্বা-আম্মার বিবাহিত জীবন ছিল ৬০ বছরের। আমার মা বলেন, তোমাদের আব্বার কোন ত্রুটি আমার কখনও চোখে পড়ে নি। আব্বার কয়েকজন সঙ্গী তাকে সবসময় দরবেশ বলে সম্বোধন করতেন । আব্বার মৃত্যুর পর অনেক অ-আহমদী মানুষ মন্তব্য করেছেন, 'আহমদীয়া জামা'ত যে আদর্শের কথা বলে তা পুরোপুরি এই ব্যক্তি পালন করেছেন'।

আব্বার আদর্শ জীবনী ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করার চেষ্টা করছি। ইবাদত সম্পর্কে প্রথমে শুরু করি। ছোটবেলা থেকেই তিনি ইবাদতে মনোযোগী ছিলেন। আব্বা অল্প বয়সে নিজ মাকে হারান। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত এই হাদিসটি যখন শুনতে পান তখন থেকে বেহেশত লাভের আশায় ঘুমন্ত মায়ের পায়ের

দিকে গিয়ে শুয়ে থাকতেন। আহমদনগর কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে আমাদের গ্রাম আড়াই কিলোমিটার দূরে। সে যুগে রাস্তার দু'পাশের জঙ্গলে বাঘ দেখা যেত। তখন তিনি কেন্দ্রীয় মসজিদে এসে মাঝে মাঝে ফজর আদায় করতেন। মা বলেন, আব্বা প্রচণ্ড শীতেও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পরিপূর্ণভাবে ওযু করতেন। আব্বার ওযু দেখে অনেকে পরিপূর্ণভাবে ওযু করতে উদ্বুদ্ধ হতেন। অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ৮৩ বছর বয়সেও গত রমযানের সবগুলো রোযা রাখতে পেরেছেন।

রমযানের পূর্বে সন্তানদের দোয়া করতে বলেছেন যেন প্রত্যেকটি রোযা রাখার তৌফিক পান। পুরো রমযান মাসে আব্বা দুর্বলতার কারণে কেবল এক ওয়াক্তের নামায বসে আদায় করেছেন। আমাকে পরিতাপ করে বলেছিলেন, 'অসুস্থতার কারণে এক ওয়াক্ত নামায বসে পড়তে হল'। মসজিদের সবচেয়ে কাছের বাড়িটি আমাদের। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে পড়তে পারতেন বলে আব্বা ভীষণ আনন্দিত ছিলেন। এছাড়া সন্তানসন্ততি মসজিদের মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারবে ভেবেও তিনি পুলকিত হতেন। ঘুমানো ছাড়া বাকি সময়টা ইবাদতে কাটাতেন। কুরআন তিলাওয়াত করতেন, ব্যাখ্যা পড়তেন, জামা'তের বই পড়তেন এছাড়া পাক্ষিক আহমদী নিয়মিত খুব মনোযোগসহ পাঠ করতেন। উৎফুল্ল মনে দোয়ায় রত থাকতেন। সন্তানসন্ততিদের কোন বিপদাপদে বিষণ্ন হতেন না। বলতেন বিপদ আসাও দরকার এতে আল্লাহকে বেশি বেশি ডাকা যায়। বলতেন দোয়া করছি আল্লাহ্ তা'লা ফযল করবেন।

খিলাফতের প্রতি উনার অগাধ ভালবাসা ছিল। হাসপাতালে শয্যায় অতিরিক্ত শ্বাসকষ্টের সময় হুযুর (আই.)-এর হোমিও ঔষুধগুলো নিয়মিত খাওয়াতে বলতেন। তখন অতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে তার কথাগুলো বুঝতে অনেক সময় লাগত। দুই শুক্রবার হাসপাতালে ছিলেন, শুক্রবারে হুযুর (আই.)-এর খুতবার সময় হলে খুতবা শুনতে পারছেন না বলে কাঁদতেন। তাই হাসপাতালের নিয়মকানুন কড়াকড়ি থাকায় মোবাইলের মাধ্যমে খুব অল্প সময় খুতবা শুনানো যেত, তাতে কিছুটা স্বস্তি পেতেন। আব্বা সুদীর্ঘ বছর জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। উনাকে কখনও জামা'তের কোন কর্মকর্তার ব্যাপারে কোন ধরনের মন্তব্য করতে দেখি নি। আমাদের পরিবারে এ বিষয়ে আব্বা কোন কথা বলতে দেন নি। কোথাও কাউকে জামা'তের ব্যাপারে কথা বলতে দেখলে প্রতিবাদ করতে না পারলে সেখান থেকে চলে আসতেন আর কষ্ট পেতেন। অবসর গ্রহণের পর বেশ কয়েক বছর আমাদের স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছেন। আব্বার ব্যাপারে একটি মন্তব্য লোকজন করতে পারে আর তা হচ্ছে তিনি অতিরিক্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন।

আমার মা সবসময় কোন না কোন শারীরিক সমস্যায় ভুগতেন। হুযুর (আই.)-এর নিকট দোয়ার আবেদন করা হয়। মায়ের শরীরের অবস্থা ভাল হলে আমরা আলোচনা করতাম স্যালাইন অথবা এই ঔষধ খুব কাজ দিয়েছে। আব্বা এতে বিরক্ত হতেন আর বলতেন না হুযুর (আই.) দোয়া করেছেন এজন্য আল্লাহ্ তা'লা শিফা দিয়েছেন। হুযুর (আই.)-এর খুতবা শুরু হলে ঘরের কেউ যাতে অনুপস্থিত না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতেন। আর টিভি সেটের খুব কাছে গিয়ে বসতেন যাতে মনোযোগে ব্যাঘাত না ঘটে। আর সপ্তাহভরে খুতবার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কুরআন হাদীস এবং জামা'ত এর কথাই সারাদিন তার মুখে উচ্চারিত হত।

পরিবারের সবাই যখন গল্প করতাম তখন চুপ হয়ে কতক্ষণ শুনতেন তারপর নসিহতের মাধ্যমে নিজের গল্প শুরু করতেন আর তা মনযোগের সহিত সবাইকে শুনতে হত। হাসপাতালে যখন শরীরের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তখনও তাগিদ করতেন আমাকে হুযুর (আই.)-এর ঔষধ খাওয়াতে। আমার অবস্থার উন্নতি না হলেও খাব। মৃত্যুবরণের সময়েও আমার বোন পানির সাথে ঔষধ দিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লার ওপর খুব ভরসা করতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কারও দ্বারা উপকৃত হলে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে খুব পছন্দ করতেন আর আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, আলহামদুলিল্লাহ্ বল। আর বলতেন যারা মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারে না তারা আল্লাহ্‌রও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারে না।

কোন বিপদ হলে বা কেউ অসুস্থ হলে খুব দোয়া করতেন আর খুব দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে, জোশের সাথে বলতেন আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করবেন, আরোগ্য দিবেন। মা যখন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরাতেন তখন আব্বা আমাকে মায়ের কাছে বসিয়ে রাখতেন আর নিজে ঘরের বাইরে পায়চারি করতেন দোয়া করতেন, কিছুক্ষণ পর আমাকে জিজ্ঞেস করতেন ব্যাথা কমেছে? আমার মেঝো বোনের ছেলে রউফ বিন মাকসুদ জুনিয়র গত বছর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। লন্ডন জামেয়ায় অধ্যয়নরত ছিল। তার অপারেশনের সময় আমরা সবাই অস্থিরতার সাথে সেজদায় দোয়া করছিলাম। আব্বাও নফল নামায পড়ছিলেন। সালাম ফিরানোর পর আমাদের নসিহত করেন, আল্লাহ্‌কে আশার সাথে ডাক এই বিশ্বাস রাখ, আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল করেন। আমাদের ভাই-বোন বেশি তাই প্রায় প্রতিবছর কারও না কারও পরীক্ষার ফল

প্রকাশের বিষয় থাকে তা ফলাফল প্রকাশের আগে আব্বা এত আশার সাথে বলতেন ইনশাআল্লাহ্ ভাল রেজাল্ট হবে। আব্বার কথা শুনে আমরা খুব ভাবনাহীন থাকতাম আর যদি ফলাফল ভাল না হত কোন রকমের চিন্তা না করতে বলতেন, পরবর্তীতে ভাল করবে ইনশাআল্লাহ। কোন কাজে বিফল হলে বলতেন ভালভাবে চেষ্টা করা হয় নি। অধৈর্য হওয়াকে খুব অপছন্দ করতেন। বলতেন চরম মুহূর্তে ধৈর্য ধরাই পুণ্যের কাজ। কারও দ্বারা কোন কষ্ট পেলে আব্বার দোয়া করা পূর্বের চাইতে আরও বেড়ে যেত আর সেই ব্যক্তির প্রতি আফসোস করতেন আর তার ক্ষমার জন্য দোয়া করতেন।

খাবার খাওয়ার পর আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতেন আর পছন্দের খাবার হলে শুকরিয়া জ্ঞাপনের বাক্যগুলো কয়েকবার উচ্চারণ করতেন। পানিও খুব সাবধানে ব্যবহার করতেন। বলতেন পানি আল্লাহর অশেষ দান।

পর্দার ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন। আব্বা তো বাড়িতে থাকত না মায়ের শাসনে আমরা বড় হয়েছি। আমাদের যখন কাঁচা বাড়ি ছিল তখনও সর্বদা রোডের দিকে আলাদা একটি দরজা ছিল যেন ভাইদের বন্ধুরা এলে আমরা কোনভাবে সামনে এসে না যাই। ভাইদের কক্ষে কম যাওয়া আমাদের বাড়ির রীতি ছিল। আব্বা বাড়িতে আসার পর পর্দার বিষয়টি আরও অনেক কঠোর হয়ে গেল। কাপড় শুকাতে গেলেও বলতেন এখানে না, মেয়েদের কাপড় এমন আড়ালে থাকবে যেখানে পুরুষ যাওয়া-আসা করবে না। পর্দা করার বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একটি রীতি ছিল, তিনি যখন একা কোন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন ঘরে ঢুকে দিক পরিবর্তন করতেন না। হাত পিছনে নিয়ে দরজা বন্ধ করতেন যাতে বাইরে থাকা কারও দিকে চোখ না পড়ে। আব্বা বলতেন, দেখ আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিরা পর্দার কত খেয়াল রাখতেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর একটি ঘটনা বলতেন। হুযুর (রা.) নিজের মেয়ের সাথে অন্য এক মেয়েকে পড়াতেন কোন কাজে উনার মেয়ে ঘরের বাইরে যাওয়ায় হুযুর (রা.) সাথে সাথে বাইরে চলে আসতেন। সেই হাদিস অনুসরণে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, যদি কোন ঘরে নারী-পুরুষ অবস্থান করে তবে সেখানে দুইজন থাকে না তিনজন থাকে তৃতীয়জন হল শয়তান।

পর্দা বলতে শুধু বোরখা পরা, মাথায় কাপড় থাকা নয়। বলতেন ভাইবোনদের মধ্যে এবং সন্তান ও পিতার মধ্যে পর্দার সীমা থাকা উচিত। তাই বলে কোন ব্যাপারে কট্টর ছিলেন না। পর্দার মধ্যে থেকে সব কাজ করার অনুমতি দিতেন। বলতেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের কথা বলেছেন। কোন বিষয়ে এমন কড়াকড়ি করা উচিত নয় যা পালন করা কঠিন হয়ে যায়।

ছোট একটি ঘটনা উল্লেখ করছি যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে খুব সাধারণ কিন্তু খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আমার এক ভাই আমার চেয়ে ২ বছরের বড়। উনার পিঠে একটি ছোট ফোঁড়া উঠেছিল। ভাই আমাকে বললেন সেখানে ঔষধ লাগিয়ে দিতে। আব্বা এটি পছন্দ করলেন না। ঔষধ লাগানোর পর বললেন, একটি নসিহত করতে চাই। ভাইবোনের মধ্যেও পর্দা থাকা উচিত। আমাদের বোনদের শোয়ার ঘরে আব্বা কখনও হঠাৎ করে ঢুকতেন না, আগে আওয়াজ করতেন।

পর্দাহীনতা একদম সহ্য করতে পারতেন না। একটি কথা সবসময় বলতেন **'যার মন পবিত্র নয়, সে খোদা থেকে কত দূরে।'** আগে তো এখনকার মত যোগাযোগ ব্যবস্থা কোথাও ছিল না। কোন এলাকায় জামা'তী ট্যুরে হেঁটে যেতেন। গ্রীষ্ম-বর্ষা যা-ই হোক, সর্বদা ছাতা হাতে বের হতেন। আব্বা আমাদেরকে বলেছেন, কোন মহিলার সামনাসামনি না হওয়ার জন্য ছাতা সেদিকে হেলিয়ে রাখতাম আর এতে অ-আহমদী মহিলারাও হেসে ফেলত।... (চলবে)


## "আহ্‌মদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহ্‌মদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিকনির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক, পাক্ষিক আহ্‌মদী,**
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশিবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

# সংবাদ

*'আহমদী' বার্তা বিভাগ*

## নাসেরাবাদ জামা'তে নও মোবাঈন সম্মেলন ও মহান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২১ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নাসেরাবাদের বাইতুল হাফিজ মসজিদ প্রাঙ্গণে নও-মোবাঈন সম্মেলন ও মহান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জুমুআর নামাজের পর বিকেল ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত উক্ত সম্মেলনের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। তারপর হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শেষে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট থেকে মহান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মোহাম্মদ ইমতিয়াজ আলী। এছাড়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী নও মোবাঈন মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। এছাড়া স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বি সিলসিলাহ্‌গণও উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি স্থানীয় চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য এই জলসায় উপস্থিত ছিলেন। জলসার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব বোরহান আহমেদ। অতঃপর নযম পেশ করেন জনাব শামিম আহমেদ। এরপর মহানবী (সা.)-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা পর্ব শুরু হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেবও উক্ত অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে আহমদীদের প্রশংসা করেন এবং এমন একটি জলসা আয়োজন করায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর তবলীগী অধিবেশন হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৬৫ জন জেরে তবলীগ ও মেহমান উপস্থিত ছিলেন এবং তারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন। ন্যাশনাল সেক্রেটারী নও-মোবাঈন মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন সাহেবের জ্ঞানগর্ভ উত্তরে তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। রাত ১১টা পর্যন্ত চলমান উক্ত জলসাতে মোট উপস্থিতি ছিল প্রায় ১৭০ জন। অবশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত জলসার সমাপ্তি হয়।

## উথলী জামা'তের আয়োজনে মহান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০২১ রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উথলীর বাইতুস সোবহান মসজিদ প্রাঙ্গণে মহান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মোহাম্মদ ইমতিয়াজ আলী। এছাড়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী নও মোবাঈন মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। এছাড়া স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বি সিলসিলাহ্‌গণও উপস্থিত ছিলেন। জলসার শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব আতাউর রহমান। এরপর নযম পেশ করেন জনাব শাহীন আহমেদ। অতঃপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা পর্ব শুরু হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। বক্তব্য শেষে তবলীগী অধিবেশন হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৫৫ জন জেরে তবলীগ ও মেহমান উপস্থিত ছিলেন এবং তারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। উক্ত জলসায় মোট উপস্থিতি ছিল প্রায় ১২০ জন। অবশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত জলসার সমাপ্তি হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"ওহী আকারে আমার প্রতি খোদার যে বাণী অবতীর্ণ হয় সেগুলোর প্রতি আমি আমারঅন্তরের অন্তস্থল থেকে এতটা বিশ্বাস রাখি যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফে আমার দাঁড়ানো অবস্থায় যে ধরনের শপথ করতে বলবে– আমি তাতে প্রস্তুত আছি। বরং আমার বিশ্বাস এই পর্যায়ের যে, আমি যদি এ বিষয়ে অস্বীকার করি অথবা এগুলো খোদার পক্ষ থেকে নয় বলে ধারণাও করি তাহলে তৎক্ষণাৎ আমি কাফের হয়ে যাব।" *(মালফুযাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭)*

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

## প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে

# বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্ক থেকে সে বিরত থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপদৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

৩

খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনাব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং নিজ পাপসমূহের জন্য প্রত্যহ ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

৪

প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষকরে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনভাবে অন্যায় কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

৬

সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করবে।

৭

অহঙ্কার ও দম্ভ সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

১০

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ তথা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্ক ও বন্ধনে অথবা তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

*(ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ: ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ইং)*

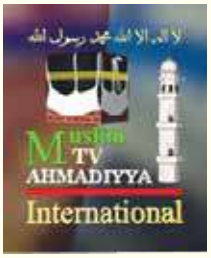


mta
INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

**এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন**

## এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE , YOU NEED -

* DIGITAL MARKETING STRATEGY
* PROMOTIONAL VIDEO
* FACEBOOK PROMOTION
* PRODUCT PHOTOGRAPHY
* PRODUCT VIDEOGRAPHY

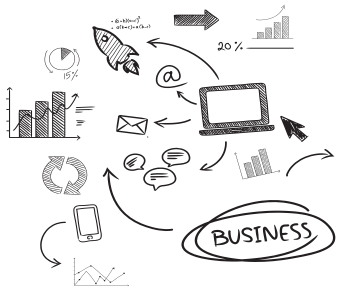


STUDIO JUNCTION
ENTERTAINMENT REIMAGINED

Find us on
STUDIOJUNCTIONBD

Dental Care

**ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি**
বি. ডি. এস (ঢাকা), পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, **মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭**

**ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন**

চেম্বার ঃ
**ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী**
১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাম্প সংলগ্ন), পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সাক্ষাতের সময় ঃ
বিকাল ৫টা - রাত ৯টা
(মঙ্গল - শুক্রবার)

**সিরিয়ালের জন্য ঃ ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫**

New Vol. No. 84 | 6th Issue

The Ahmadi Fortnightly Since 1922

30th September, 2021 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

# বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

## হুওয়াশ্ শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. **(Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200**

২. **Chelidonium Q (Mother tincture)**

### বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।

২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

### ৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।

২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

### ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

*প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:*

**ডা. রবিউল হক**, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

## মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْحَمْدُ لله الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
**www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv**
**www.theahmadi.org** (Pakkhik Ahmadi web site live now)